Recommended by the West Bengal Board of Secondary
Education as a Text-book of History **for Class VII.**
Vide Notification No. TB/76/7/H/21, Dated 27. 12. 76.

স্বদেশ কাহিনী

দ্বিতীয় ভাগ

[সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য]

অধ্যাপক শ্রীসমরেশ ঘোষ, এম. এ.
ইতিহাস বিভাগীয়-প্রধান—প্রভু জগদ্বন্ধু কলেজ,
আন্দুল মৌড়ী, হাওড়া।

দেব সাহিত্য কুটীর

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক নূতন প্রবর্তিত পাঠ্যক্রম অনুসারে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে 'স্বদেশ কাহিনী' (দ্বিতীয় ভাগ) রচিত হইয়াছে। পুস্তকটিতে পাঠ্যক্রমের সম্পূর্ণ অনুসরণ করা হইয়াছে।

'স্বদেশ কাহিনী' (প্রথম ভাগ)-এর ন্যায় বর্তমান পুস্তকটির সাফল্যের জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সক্রিয় সহানুভূতি কামনা করি।

১লা নভেম্বর, ১৯৭৪
প্রভু জগদ্বন্ধু কলেজ
হাওড়া।

—সমরেশ ঘোষ

নূতন সংস্করণের ভূমিকা

'স্বদেশ কাহিনী'র (দ্বিতীয় ভাগ) নূতন সংস্করণ পূর্ববর্তী সংস্করণের মুদ্রণ এবং অন্যান্য ত্রুটি হইতে মুক্ত, পুস্তকটির মান আরও উন্নয়নের জন্য ইতিহাসে আগ্রহী ব্যক্তিদের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হইবে।

—সমরেশ ঘোষ

সূচীপত্র

স্বদেশ কাহিনী

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভারতের প্রাচীনত্ব ও সভ্যতা

ভারতবর্ষ পৃথিবীর প্রাচীনতম দেশগুলির অন্যতম। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষ ছিল সভ্যতার লীলাভূমি। পৃথিবীর শৈশবকালে যে সকল ভূখণ্ডে মানবজাতি বসবাস করিত, ভারতবর্ষ ইহাদের অন্যতম।

পৃথিবীতে মানবজাতির আবির্ভাবকালের প্রথম যুগকে পুরাতন প্রস্তরযুগ বলা হয়। পুরাতন প্রস্তরযুগে ভারতবর্ষেও মানবজাতির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। ঐ যুগে মানবজাতি প্রস্তর দ্বারা অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করিত। ঐ সকল অস্ত্রশস্ত্রকে তীক্ষ্ণ এবং মসৃণ করিবার মত জ্ঞানও তাহাদের ছিল না। ঐ সকল অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা পশু শিকার করিত। পশু শিকারই ছিল তাহাদের জীবন ধারণের প্রধান উপায়, কারণ ঐ সময়ে কৃষির প্রচলন ছিল না।

পুরাতন প্রস্তরযুগ

পুরাতন প্রস্তর যুগের অধিবাসিগণ ধাতুর ব্যবহার জানিত না। ঐ যুগের অপর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল, ঐ যুগে ধাতুর ন্যায় অগ্নির ব্যবহারও ছিল না।

পুরাতন প্রস্তরযুগের পরবর্তী যুগকে নব্য প্রস্তরযুগ বলা হয়। ঐ যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের ন্যায় ভারতে বসবাসকারী মানবগণও পুরাতন প্রস্তরযুগ অপেক্ষা উন্নততর জীবন যাপন করিতে শিখিয়াছিল। তাহারা অস্ত্রশস্ত্র মসৃণ এবং তীক্ষ্ণ করিবার জ্ঞানও লাভ করে। ঐ যুগে অগ্নির ব্যবহারেরও প্রচলন হয়। পুরাতন প্রস্তরযুগে

নব্য প্রস্তরযুগ

শিকারই ছিল একমাত্র জীবন ধারণের উপায়, কিন্তু নব্য প্রস্তরযুগে মানবজাতি কৃষিকার্যের দ্বারা ফসল উৎপাদন করিয়া জীবন ধারণ করিতে শিখিয়াছিল। তাহারা মৃত ব্যক্তিকে সমাধিস্থ করিতে এবং পাথর দ্বারা সমাধি স্থান নির্মাণ করিয়া মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেও শুরু করে।

তাম্রযুগ

নব্য প্রস্তরযুগের পরবর্তী যুগকে তাম্রযুগ বলা হইয়া থাকে। ঐ যুগে মানবজাতি তাম্রের ব্যবহার করিতে থাকে। কিন্তু ঐ যুগে লৌহের ব্যবহার ছিল না।

তাম্র-প্রস্তরযুগ

নব্য প্রস্তরযুগ এবং তাম্রযুগের সন্ধিক্ষণের যুগকে তাম্র-প্রস্তর-যুগ বলা হয়। ঐ যুগের অধিবাসিগণ উন্নত সভ্যতার অধিকারী ছিল। ঐ যুগের সভ্যতার নিদর্শন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ভূগর্ভ খনন করিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন। ভারতে তাম্র-প্রস্তর যুগের যে সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা নামে পরিচিত।

অনুশীলনী

১। ভারতের প্রাচীনত্ব এবং প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। পুরাতন প্রস্তরযুগ, নব্য প্রস্তর যুগ, তাম্রযুগ এবং তাম্র-প্রস্তরযুগের ভারত সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

(ক) পুরাতন প্রস্তরযুগে ভারতে মানবের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল কি?

(খ) কোন যুগে মানব জাতি অগ্নি ব্যবহার করিবার জ্ঞান লাভ করে?

(গ) তাম্র-প্রস্তরযুগে ভারতে যে সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে সেই সভ্যতা কি নামে পরিচিত?

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা

বর্তমান শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত ঐতিহাসিকগণের ধারণা ছিল যে ভারতে প্রথম সভ্যতার বিকাশ ঘটে আর্য জাতির আগমনের পরবর্তী কালে। কিন্তু বর্তমান শতকের প্রথমার্ধে বাঙালী ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্যার জন মার্শালের নেতৃত্বে খনন কার্যের ফলে (বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত) পাঞ্জাবের হরপ্পা এবং সিন্ধুর মোহেঞ্জোদরোতে এক উন্নত সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ আবিষ্কারের ফলে ঐতিহাসিকগণের ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়াছে, কারণ ঐ সভ্যতা খ্রীষ্ট জন্মের তিন হাজার বৎসরের পূর্বেকার বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। সুতরাং সিন্ধু-সভ্যতা আর্যগণের এদেশে আগমনের পূর্বেই বিকাশ লাভ করিয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

প্রাক্-আর্য সভ্যতা

কোন কোন পণ্ডিতের মতে সিন্ধু-সভ্যতার সৃষ্টি করেন দ্রাবিড়গণ। আবার কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ঐ সভ্যতা পশ্চিম এশিয়াতে প্রথম বিকাশ লাভ করে, পরে ভারতে প্রসার লাভ করে। কিন্তু ঐ দুইটি মতের মধ্যে কোন একটি সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃতি লাভ করে নাই।

সিন্ধু-উপত্যকার অধিবাসীদের সামাজিক জীবন ঃ সিন্ধু-সভ্যতা ছিল প্রধানতঃ নগরকেন্দ্রিক। মোহেঞ্জোদরোর ন্যায় অপর একটি সুপরিকল্পিত শহরের অস্তিত্ব প্রাচীনকালে ছিল কিনা সেই বিষয়ে বহু পণ্ডিত সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। মোহেঞ্জোদরোর ধ্বংসাবশেষ হইতে বহু ইষ্টক নির্মিত গৃহ, রাজপথ এবং পয়ঃপ্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐগুলি হইতে মোহেঞ্জোদরো নগরের অধিবাসীদের স্থাপত্য-শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞান কত গভীর ছিল তাহা অনুমান করা যায়।

নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা

মোহেঞ্জোদরোর ধ্বংসাবশেষ হইতে যে সকল নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে বিশালায়তন স্নানাগারটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্নানাগারটির দৈর্ঘ্য ১৮০ ফুট এবং প্রস্থ ১০৮ ফুট। কূপ হইতে পয়ঃপ্রণালীর মাধ্যমে উহাতে জল সরবরাহ করা হইত।

ধাতুর ব্যবহার

ঐ সময়ে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার ছিল। সম্ভবতঃ লৌহের ব্যবহার ছিল না। অস্ত্রশস্ত্র এবং গৃহস্থালির জন্য ব্যবহারোপযোগী পাত্রাদি তাম্র এবং ব্রোঞ্জ দ্বারা নির্মিত হইত।

গম, যব, মৎস্য, মাংস প্রভৃতি নিরামিষ এবং আমিষ উভয় প্রকার খাদ্যের প্রচলন ছিল। দুগ্ধ পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হইত।

বৎসরের অধিকাংশ সময়ে তুলা-নির্মিত বস্ত্রাদির ব্যবহার ছিল। শীতকালে পশমের ব্যবহার ছিল।

ধ্বংসাবশেষ হইতে সুন্দর মৃৎপাত্র, তাম্র, রৌপ্য এবং চীনামাটি নির্মিত পাত্রাদি, হস্তিদন্তনির্মিত চিরুনি, সূচ, তাম্র ও ব্রোঞ্জ-নির্মিত কাটারি, ছুরি, কুঠার প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী পাওয়া গিয়াছে।

জীবনধারণ পদ্ধতি

স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে অলংকার ব্যবহার করিত। অলংকার নির্মাণের উপকরণ হিসাবে স্বর্ণ, রৌপ্য, গজদন্ত, ঝিনুক, মূল্যবান্ পাথর প্রভৃতির ব্যবহার ছিল। অলংকারগুলির গঠন-নৈপুণ্য প্রশংসা দাবি করে।

সিন্ধু-উপত্যকায় যে সকল ভগ্নমূর্তি পাওয়া গিয়াছে সেইগুলি হইতে ঐ যুগের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনুমান করা যায়। নারীদের মধ্যে নৃত্যের প্রচলন ছিল।

ধ্বংসাবশেষ হইতে কুঠার, ছুরি, বর্শা, গদা পাওয়া যাইলেও তরবারি পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ তরবারির প্রচলন ছিল না। তাম্র, ব্রোঞ্জ এবং প্রস্তরনির্মিত অস্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

যে সকল জীবজন্তুর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে সেইগুলি ঐ যুগের শিল্প-কলা কি প্রকার উন্নত ছিল তাহার পরিচয় দান করিতেছে।

ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রাপ্ত পাত্রাদির গাত্রে অঙ্কিত জীবজন্তুর আলেখ্য এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীও ঐ যুগে শিল্পের উন্নতির সাক্ষ্য বহন করিতেছে। ঐগুলি হইতে সিন্ধু-উপত্যকার অধিবাসীদের রুচি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়।

শিল্প

ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রাপ্ত মনুষ্যমূর্তিগুলিও উচ্চ প্রশংসার দাবি করিতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ মূর্তিই ভগ্ন।
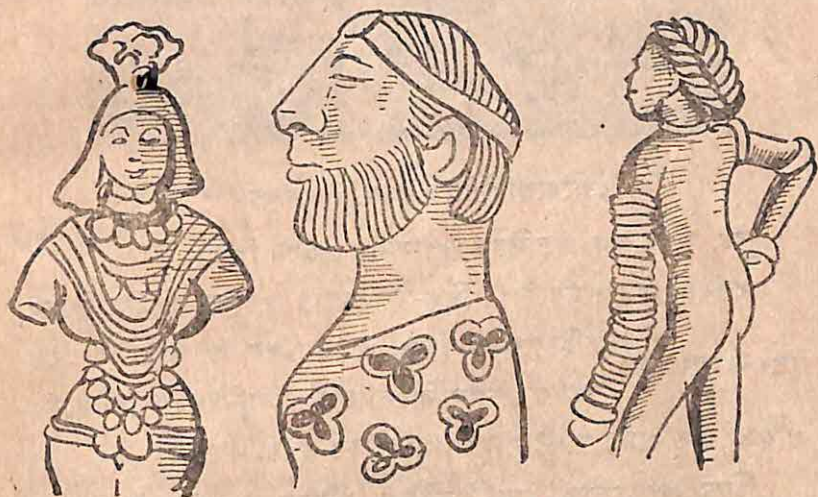
মোহেঞ্জোদরোতে প্রাপ্ত মনুষ্যমূর্তি

গৃহপালিত জন্তু হিসাবে বৃষ, গাভী, মহিষ, উষ্ট্র, মেষ, হস্তী, কুকুর প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ অশ্বের প্রচলন ছিল না। কারণ অন্যান্য জীবজন্তুর কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইলেও অশ্বের কঙ্কাল পাওয়া যায় নাই।

সিন্ধু-উপত্যকার ধর্ম ঃ সিন্ধু-উপত্যকায় কি প্রকার ধর্মের প্রচলন ছিল তাহা আজিও সঠিক ভাবে জানা যায় নাই। মাতৃকা-পূজার প্রচলন ছিল। সম্ভবতঃ দেবমন্দির নির্মিত হইত না। শিবের পূজার প্রচলন ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। কারণ, মোহেঞ্জোদরোতে যে সকল **সীলমোহর**

ধর্ম

পাওয়া গিয়াছে তাহাদের একটিতে পশু দ্বারা পরিবেষ্টিত মূর্তি অঙ্কিত আছে, সম্ভবতঃ ঐ মূর্তিটি শিবের। শিবের অপর নাম পশুপতি।

মোহেঞ্জোদরোতে প্রাপ্ত সীলমোহর

বৃষ, অশ্বত্থ বৃক্ষ প্রভৃতিরও উপাসনার প্রচলন ছিল।

হিন্দুধর্মের উপর প্রভাব

বর্তমান হিন্দুধর্মের উপর সিন্ধু-উপত্যকায় প্রচলিত ধর্মের প্রভাব রহিয়াছে। হিন্দু ধর্মেও শিব ও শক্তি উভয়ের পূজার প্রচলন রহিয়াছে। সিন্ধু-উপত্যকার ধর্মের সহিত হিন্দু ধর্মের যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

সিন্ধু-উপত্যকার অর্থনৈতিক জীবন ঃ সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা ছিল প্রধানতঃ নগরকেন্দ্রিক। সেইজন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর অর্থনৈতিক জীবন নির্ভর করিত। ঐ অঞ্চলের অধিবাসিগণ শিল্পে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে দক্ষ ছিল। সম্ভবতঃ পশ্চিম এশিয়ার

বাণিজ্য

টাইগ্রীস এবং ইউফ্রেটিস নদীর তীরবর্তী ভূখণ্ডের অধিবাসীদের সহিত তাহাদের বাণিজ্য চলিত। তাম্র, মূল্যবান্ প্রস্তরসমূহ, টিন প্রভৃতি এদেশে আমদানী করা হইত।

শিল্প

সিন্ধু-উপত্যকার অধিবাসিগণ বিভিন্ন প্রকার শিল্পে লিপ্ত ছিল। ধাতু শিল্পে লিপ্ত থাকিয়া বহু লোক জীবিকা অর্জন করিত। কুম্ভকার, তন্তুবায়, সূত্রধর, কর্মকার, স্বর্ণকার, গজদন্ত শিল্পী, স্থপতি প্রভৃতিরও অস্তিত্ব ছিল।

বাণিজ্য এবং শিল্প ব্যতীত জীবিকার্জনের অপর উপায় ছিল কৃষি এবং পশুপালন। গম, যব প্রভৃতি খাদ্যশস্য এবং তুলা ছিল প্রধানতঃ কৃষিজাত পণ্য।

কৃষি ও পশুপালন

সিন্ধু-উপত্যকায় বহু লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজিও তাহাদের পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নাই। ফলে সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আজিও অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।

অনুশীলনী

১। সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতার বিবরণ দাও।

২। সিন্ধু-উপত্যকার অধিবাসীদের সামাজিক জীবনের বিবরণ দাও।

৩। সিন্ধু-উপত্যকার অধিবাসীদের ধর্ম এবং অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

মৌখিক প্রশ্ন :

(ক) সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতার আবিষ্কার কে করেন?

(খ) সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতায় অশ্বের ব্যবহার ছিল কি?

(গ) সিন্ধু-উপত্যকায় যে সকল লিপি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের পাঠোদ্ধার কি সম্ভব হইয়াছে?

(ঘ) হিন্দুধর্মের উপর সিন্ধু-উপত্যকায় প্রচলিত ধর্মের কোন প্রভাব পড়িয়াছিল কি?

———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বৈদিক-যুগের আর্যগণের ইতিহাস

ভারতে আর্যগণের বসতি স্থাপনের পর যে সভ্যতার বিকাশ ঘটে তাহা বৈদিক সভ্যতা নামে খ্যাত। পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকের মতে আর্যগণ ভারতের বাহিরে মধ্য এশিয়া, অথবা উত্তর ইওরোপ বা অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া হইতে প্রথমে ইরানে বসবাস শুরু করে, পরে তাহাদের একটি শাখা ভারতে প্রবেশ করে। আর্যগণের অন্যান্য শাখা ইওরোপের বিভিন্ন দেশে বসবাস করিতে থাকে।

আর্যদের আগমন

আর্যগণের এদেশে আগমনের সঠিক কারণ অজ্ঞাত রহিয়াছে। অনেকে অনুমান করেন যে আর্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানাভাব এবং খাদ্যাভাব দেখা দিলে তাহারা নূতন বাসস্থানের সন্ধান করিবার কালে এদেশে আগমন করে।

আগমনের কারণ

আর্যগণের আগমনের পূর্বে দ্রাবিড় জাতি কর্তৃক এক উন্নত সভ্যতার সূত্রপাত ঘটে। আর্যগণ এদেশে আগমন করিলে দ্রাবিড়গণ পরাজিত হইয়া দক্ষিণ ভারতে চলিয়া যায়।

আর্যগণ ভারতের উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ ধরিয়া এদেশে প্রবেশ করে। প্রথম আর্য-বসতি স্থাপিত হয় সপ্তসিন্ধু (সিন্ধু প্রভৃতি সাতটি নদী বিধৌত) অঞ্চলে, আর্যগণ আফগানিস্তানের পূর্ব অঞ্চল হইতে গাঙ্গেয় উপত্যকা পর্যন্ত বিরাট এলাকা জুড়িয়া বসতি বিস্তার করে। ঐ অঞ্চলের পুরাতন অধিবাসী অনার্যদের সহিত আর্যদের দীর্ঘদিন ধরিয়া সংগ্রাম চলিয়াছিল। আর্যগণ অনার্যদের 'দস্যু' বা 'দাস' নামে অভিহিত করিত। অনার্যগণ আর্যদের নিকট পরাজিত হইয়া পর্বতে বা জঙ্গলে পলায়ন করে নতুবা আর্যগণের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হয়। কুরুক্ষেত্র,

বসতি বিস্তার

কোশল, বিদেহ, মগধ এবং পরবর্তী যুগে দক্ষিণ ভারতেও আর্য অধিকার বিস্তার লাভ করে।

বৈদিক সাহিত্য : বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান। হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস বেদ ঈশ্বরের বাণী—ঋষিগণ কর্তৃক শ্রুত। বহুকাল ইহা লিখিত আকারে ছিল না, সেইজন্য ইহার অপর নাম শ্রুতি।

বৈদিক সাহিত্য সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ এই চারি ভাগে বিভক্ত। সংহিতা আবার ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ এবং অথর্ববেদ—এই চারি ভাগে বিভক্ত। সংহিতা কতকগুলি মন্ত্রের সমষ্টি।

বৈদিক সাহিত্যসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম বলিয়া স্বীকৃত ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলির অধিকাংশই প্রাকৃতিক দেব-দেবীর উদ্দেশে রচিত। সামবেদের মন্ত্রগুলি যজ্ঞকালে সংগীতরূপে ব্যবহৃত হইত।

সংহিতা :—
চারিবেদ

যজুর্বেদ পদ্য এবং গদ্যাকারে সংকলিত। যজ্ঞানুষ্ঠানে ক্রিয়া-কার্যের জন্য ব্যবহৃত হইত। অথর্ববেদ চারিটি বেদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্বল্পসংখ্যক মন্ত্রের সমষ্টি। ইহাতে অপদেবতা এবং উপদেবতাগণেরও উপাসনার মন্ত্রাদি রহিয়াছে।

ব্রাহ্মণ

বৈদিক সাহিত্যের ব্রাহ্মণ ভাগ গদ্যাকারে রচিত। ব্রাহ্মণে যাগ-যজ্ঞের আচারাদির সম্বন্ধে উল্লেখ রহিয়াছে।

আরণ্যক

ব্রাহ্মণ ভাগের পরিশিষ্টকে 'আরণ্যক' বলা হইয়া থাকে। যাঁহারা বৃদ্ধ বয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া বনবাসী হইতেন, তাঁহাদের জীবন যাপনের নির্দেশ ইহাতে বর্ণিত আছে।

উপনিষদ

উপনিষদগুলি বেদান্ত নামে পরিচিত। বেদের অন্ত বা উপসংহার হিসাবে উপনিষদগুলি ঐ নামে পরিচিত। উপনিষদগুলির সংখ্যা শতাধিক। তাহাদের মধ্যে ঈশ, কঠ, কেন, ঐতরেয়, বৃহদারণ্যক, মাণ্ডূক্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বৈদিক সাহিত্যে বেদাঙ্গ ছয়টি। শিক্ষা (বিশুদ্ধ উচ্চারণ), ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত (শব্দের উৎপত্তি বিষয়ক), জ্যোতিষ ও কল্প

(ধর্মের রীতি-নীতি নির্ধারক)—এই ছয় ভাগে বেদাঙ্গ বিভক্ত। বৈদিক সাহিত্যকে সম্যক্ উপলব্ধি করিবার, স্মরণ রাখিবার এবং নির্ভুল উচ্চারণ করিবার জন্য বেদাঙ্গের সৃষ্টি হয়।

বৈদিক ধর্ম : ঋগ্বেদের যুগে আর্যগণ প্রাকৃতিক শক্তির ক্ষমতায় অভিভূত হইয়া প্রকৃতির বিভিন্ন রূপকে পূজা করিতেন। জলের দেবতা বরুণ, বৃষ্টি ও বজ্রের দেবতা ইন্দ্র, ঝড়ের দেবতা মরুৎ, অগ্নি, বায়ু, সূর্য, ঊষা, রুদ্র প্রভৃতির উল্লেখ এবং মহিমা ঋগ্বেদে বর্ণিত হইয়াছে।

বৈদিক যুগে উপাস্য দেব-দেবীগণের মধ্যে পুরুষ দেবতাদের প্রাধান্য ছিল।

বৈদিক যুগে বহু দেব-দেবীর উপাসনার প্রচলন থাকিলেও আর্যগণ একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করিতেন বলিয়া অনুমান করা হয়।

বৈদিক যুগে মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল না। দেব-দেবীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য দুগ্ধ, ঘৃত, শস্যাদি উৎসর্গ করা হইত। পরবর্তী কালে যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানের প্রচলন হয়। দুগ্ধ, ঘৃত, শস্য, মধু, মাংস এবং সোমরস যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হইত।

পরবর্তী কালে পূজা-পদ্ধতি জটিল হইতে থাকে এবং পুরোহিত শ্রেণীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ঋগ্বেদের যুগের বহু দেব-দেবীর গুরুত্বও হ্রাস পায়। বিষ্ণুর উপাসনারও প্রচলন শুরু হয়। উপনিষদে কর্মফল ও জন্মান্তরবাদ স্থান পায়।

বৈদিক সমাজ : বৈদিক যুগের প্রথম ভাগে সমাজের ভিত্তি ছিল পরিবারের উপর প্রতিষ্ঠিত। গৃহকর্তাকে গৃহপতি বলা হইত।

বৈদিক যুগের প্রথম ভাগে নারীর সম্মান বজায় ছিল। স্ত্রীলোকদের একাধিক বিবাহের প্রচলন ছিল না, কিন্তু বিধবাবিবাহের প্রচলন ছিল। স্ত্রীলোকগণ বাল্যে পিতৃগৃহে বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। ধর্মকর্মে স্বামীকে স্ত্রী সাহায্য করিতেন। ঘোষা, অপালা, গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি বহু বিদুষীর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল।

নারীর স্থান

বৈদিক যুগের প্রথম ভাগে জাতিভেদ প্রথার অস্তিত্ব ছিল কিনা

নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। সম্ভবতঃ গুণ ও কর্মের বিচারে সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। প্রথম তিন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহের প্রচলন ছিল। অব্রাহ্মণও শাস্ত্র পাঠ করিতে পারিত এবং জাতিভেদের কঠোরতাও ছিল না। ক্ষত্রিয়ের বাহুবলও স্বীকৃত হইত।

চতুর্বর্ণ

আর্যদের সামাজিক জীবনে 'চতুরাশ্রম' প্রথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি ভাগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের জীবন বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকটি ভাগ এক একটি আশ্রম নামে পরিচিত ছিল।

চতুরাশ্রম

ব্রহ্মচর্যে বালকদিগকে গুরুগৃহে অধ্যয়ন এবং ধর্মানুষ্ঠান শিক্ষা করিতে হইত। পরবর্তী জীবনে সংসারধর্ম পালন করিতে হইত। বানপ্রস্থাশ্রমে প্রৌঢ় ব্যক্তিদিগকে বনে তপস্বীর জীবন যাপন করিতে হইত। সন্ন্যাসাশ্রম ছিল সর্বশেষ পর্যায়, ঐ সময়ে বৃদ্ধ ব্যক্তিগণ পরমার্থ চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন।

পশম, তুলা এবং মৃগচর্ম নির্মিত বস্ত্রাদির ব্যবহার ছিল। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে অলংকার পরিধান করার প্রচলন ছিল। খাদ্য ও পানীয়রূপে গম, যব, দুগ্ধ ব্যবহৃত হইত। উৎসবে গো-মাংস ভক্ষণ এবং সোমরস পানও চলিত। অশ্ব চালনা, রথ চালনা, মৃগয়া, নৃত্যগীত প্রভৃতির মাধ্যমে অবসর বিনোদন করার প্রচলন ছিল।

জীবনযাত্রার বিবরণ

বৈদিক যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা : বৈদিক যুগের প্রথম ভাগের সভ্যতা ছিল গ্রামভিত্তিক, জীবিকানির্বাহের প্রধান উপায় ছিল কৃষি ও পশুপালন। গৃহপালিত পশুদের মধ্যে প্রধান ছিল গাভী। অশ্ব, গর্দভ, মেষ, ছাগ এবং কুকুরও পালিত হইত। কৃষির উন্নতির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইত। জলসেচের ব্যবস্থা ছিল।

গ্রামভিত্তিক সভ্যতা

বিভিন্ন শিল্পেরও অস্তিত্ব ছিল। সূত্রধর, তন্তুবায়, চর্মকার, ধাতুশিল্পী প্রভৃতির অস্তিত্ব ছিল।

শিল্প

পণ্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য মুদ্রা অপেক্ষা বিনিময় প্রথার অধিক প্রচলন ছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার

বৈদিক যুগের শেষ ভাগে আর্য-সভ্যতা নগরকেন্দ্রিক হইতে শুরু করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটিতে শুরু করে, সমুদ্র পথেও বহির্জগতের সহিত বাণিজ্য চলিতে শুরু করে।

পরবর্তী কালের বৈদিক সাহিত্য—মহাকাব্যদ্বয়ঃ বৈদিক যুগের শেষ ভাগে যে সাহিত্য রচিত হয় তাহাতে 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'—মহাকাব্য দুইটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

রামায়ণঃ হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস যে, রামায়ণ মহাকবি বাল্মীকির রচিত। কিন্তু রামায়ণ রচনার সময়ে আয়তনে বৃহৎ ছিল না, পরবর্তী কালে বহুজন কর্তৃক সংযোজিত হওয়ার ফলে রামায়ণের আয়তন বৃদ্ধি পায়।

রামায়ণে অযোধ্যার রাজার পুত্র রামচন্দ্রের জীবন বৃত্তান্তের বর্ণনা রহিয়াছে।

রামায়ণের গুরুত্ব

রামায়ণের গুরুত্ব অসাধারণ। রামায়ণে বর্ণিত রাম-রাবণের যুদ্ধ বলিতে দক্ষিণ ভারতে আর্য সভ্যতার বিস্তারের জন্য যুদ্ধের ইতিহাস বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন।

মহাভারতের রচয়িতা বেদব্যাস বলিয়া হিন্দুগণের প্রচলিত বিশ্বাস রহিয়াছে। রামায়ণের ন্যায় মহাভারতের আয়তনও পরবর্তী কালে বৃদ্ধি পায়। মহাভারতে কুরু ও পাণ্ডবগণের মধ্যে যুদ্ধের বর্ণনা রহিয়াছে।

মহাভারতঃ মহাভারতের কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধকে অনেকে আর্যগণের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ অথবা আর্যগণ এবং হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চল হইতে আগত পীত জাতির সংগ্রামের বর্ণনা বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন।

উভয় মহাকাব্যে ক্ষত্রিয়গণের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অনেকে রামায়ণ মহাভারতের পূর্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করেন।

সমাজ চিত্র

মহাকাব্য দুইটিতে জাতিভেদের কঠোরতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বহুবিবাহ, স্ত্রীলোকগণ কর্তৃক একাধিক বিবাহ (দ্রৌপদীর বিবাহ), সহমরণ প্রভৃতি প্রথার অস্তিত্ব ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়।

অবতার

মহাকাব্য দুইটিতে বৈদিক যুগের পুরাতন দেবতাগণের পরিবর্তে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গণেশ ও পার্বতী প্রভৃতির উপাসনার উল্লেখ রহিয়াছে। রামায়ণের রাম এবং মহাভারতের কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতাররূপে পূজিত হন।

জনগণের উপর প্রভাব

মহাকাব্য দুইটির সারা ভারতে অসীম প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণে রামের পিতৃভক্তি, ভরত এবং লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি শ্রদ্ধা, সীতার পতিভক্তি, মহাভারতের ভীষ্ম, বিদুর, দ্রোণাচার্য প্রভৃতির বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপ সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

মহাকাব্য দুইটির কাহিনীর অনুসরণে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় কবি এবং লেখকগণ বহু কবিতা এবং কাহিনী রচনা করিয়াছেন।

অনুশীলনী

১। বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
২। রামায়ন ও মহাভারতের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর।
৩। বৈদিক সমাজের আলোচনা কর।
৪। বৈদিক ধর্ম সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
৫। বৈদিক যুগের অর্থনৈতিক জীবনের উল্লেখ কর।

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

(ক) বৈদিক সভ্যতার স্রষ্টা কাহারা? (খ) চতুর্বর্ণ কাহাকে বলে? (গ) চতুরাশ্রম কি? (ঘ) রামায়ন ও মহাভারতে জাতিভেদ প্রথার ইঙ্গিত পাওয়া যায় কি?

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মহাবীর ও বুদ্ধের জীবনী এবং ধর্মমত

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে আর্যাবর্তে জৈনধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম নামক দুইটি নূতন ধর্মের উৎপত্তি হয়।

মহাবীর

মহাবীরঃ চব্বিশজন তীর্থংকর কর্তৃক জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়, মহাবীর ছিলেন সর্বশেষ তীর্থংকর। তীর্থংকর শব্দের অর্থ মুক্তিপথ প্রদর্শনকারী।

মহাবীর উত্তর বিহারের বৈশালী নগরীর নিকটে কুন্দগ্রাম নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মকাল সঠিকভাবে জানা যায় না। মহাবীর বর্ধমান নামেও পরিচিত ছিলেন।

মহাবীর ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পত্নীর নাম যশোদা, তাঁহার একটি কন্যা জন্মে। ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি (মহাবীর) গৃহীর জীবন যাপন করিয়াছিলেন। অতঃপর সংসারধর্মে তাঁহার বিতৃষ্ণা জাগে, তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া পরবর্তী দ্বাদশ বৎসর বিভিন্ন দেশ পর্যটন করেন এবং কঠোর তপস্যায় সিদ্ধিলাভ

জীবনী

করেন। সিদ্ধিলাভের পর তিনি 'জৈন' বা রিপুজয়ী হিসাবে পরিচিত হন। অতঃপর ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তিনি মগধ, বিদেহ, কোশল প্রভৃতি রাজ্যে তাঁহার ধর্মমত প্রচার করেন। প্রবাদ আছে যে মগধরাজ বিম্বিসার এবং তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু তাঁহার প্রচারিত ধর্মমতের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন।

ধর্মমত

মহাবীরের শিষ্যগণ 'জৈন' নামে পরিচিত ছিলেন। মহাবীর পাটনা জেলার পাবা নামক স্থানে ৭২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

মহাবীরের পূর্ববর্তী তীর্থংকর ছিলেন **পার্শ্বনাথ**। তিনি হিংসা আচরণ, মিথ্যা বলা, চুরি এবং দ্রব্য পরিগ্রহ করিতে নিষেধ করিতেন। মহাবীর পার্শ্বনাথের ঐ চারিটি উপদেশের সহিত আরও একটি উপদেশ যোগ করেন। তিনি বলিতেন যে, জিতেন্দ্রিয় হইতে হইবে।

জৈনগণের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস যে মহাবীরের ধর্ম বিষয়ের উপদেশাবলী ১৪টি প্রাচীন গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছিল—ঐগুলি 'পূর্ব' নামে পরিচিত। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষভাগে জৈনধর্মাবলম্বীদের এক মহাসভা অনুষ্ঠিত হয় পাটলীপুত্রে। ঐ মহাসভায় মহাবীরের উপদেশাবলী সংগ্রহ করিয়া দ্বাদশটি 'অঙ্গ' সংকলিত হয়। ঐ দ্বাদশটি অঙ্গ ব্যতীত 'উপাঙ্গ', 'মূলসূত্র' প্রভৃতি গ্রন্থগুলিও জৈনধর্মশাস্ত্র হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।

দ্বাদশ অঙ্গ

জৈনধর্মে কৃচ্ছ্র সাধনকেই মোক্ষলাভের একমাত্র পথ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মহাবীরের মৃত্যুর পর জৈনধর্ম 'শ্বেতাম্বর' ও 'দিগম্বর' এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। শ্বেতাম্বরগণ শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিতেন এবং দিগম্বরগণ মহাবীরের নির্দেশ অনুযায়ী বস্ত্র পরিধান না করায় ঐ নামে পরিচিত হন।

'শ্বেতাম্বর' ও 'দিগম্বর'

গৌতম বুদ্ধ : গৌতম বুদ্ধ যে ধর্মের প্রচার করেন তাহা বৌদ্ধধর্ম নামে খ্যাত। তাঁহার সংসার জীবনে নাম ছিল সিদ্ধার্থ বা গৌতম। হিমালয়ের পাদদেশে নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্তু নগরের নিকট লুম্বিনী নামক উদ্যানে তাঁহার জন্ম হয়। মহাবীরের ন্যায় বুদ্ধেরও জন্ম তারিখ আজিও সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই।

গৌতম বুদ্ধ

সিদ্ধার্থের পিতা ছিলেন শুদ্ধোদন এবং মাতা মায়া দেবী। শুদ্ধোদন শাক্য রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। ঐ কারণে সিদ্ধার্থ পরবর্তী জীবনে 'শাক্যমুনি' নামেও পরিচিত হন।

সিদ্ধার্থের জন্মের পর মাতার মৃত্যু হয়। তাঁহার বিমাতা এবং মাতৃষ্বসা প্রজাপতি গৌতমী কর্তৃক সিদ্ধার্থ লালিত পালিত হন। বাল্যকাল হইতেই সিদ্ধার্থ ভোগৈশ্বর্যের মধ্যে লালিত পালিত হইতে থাকেন। গোপা বা যশোধরা নাম্নী এক অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের সময় সিদ্ধার্থের বয়স ছিল ষোল বৎসর। উনত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার এক পুত্রসন্তান জন্মে। ঐ পুত্রের নাম রাখা হয় রাহুল।

পুত্রের জন্মের পর সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করিবার সংকল্প করেন। ইতিপূর্বে বিভিন্ন ঘটনা তাঁহাকে সংসার-জীবনের প্রতি অনাসক্ত

করিয়া তোলে। কথিত আছে যে একদিন রথে চড়িয়া নগর পরিভ্রমণ করিবার সময়ে তিনি এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধকে দেখিয়া চঞ্চল হইয়া পড়েন এবং সারথির নিকট হইতে জানিতে পারেন যে জরা মানুষের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। কিছুকাল পরে এক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং আরও কিছুকাল পরে একটি মৃতদেহ দেখিয়া সারথির নিকট হইতে জানিতে পারেন যে, মানুষ জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যুর কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না। ঐ সকল বিষয় জানিতে পারিয়া সিদ্ধার্থ চিন্তায় আকুল হইয়া পড়েন এবং সংসার-জীবনের প্রতি তাঁহার অনাসক্তি বৃদ্ধি পায়। ঐ সময়ে এক সন্ন্যাসীর দর্শনলাভ করেন। সন্ন্যাসী সিদ্ধার্থকে বলেন যে, সন্ন্যাস গ্রহণই জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষালাভের একমাত্র উপায়।

সংসারে অনাসক্তি

পুত্রের জন্মের পর সিদ্ধার্থ আশঙ্কা করেন যে পুত্রস্নেহ তাঁহাকে সংসারের মায়াজালে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে—সেইজন্য একদিন গভীর রাত্রে সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করেন।

গৃহত্যাগ

গৃহত্যাগের পর ছয় বৎসর বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া তিনি নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। রাজগৃহে (বর্তমান রাজগির) দুইজন গুরুর নিকট শাস্ত্রপাঠ করেন। গয়ার নিকট নৈরঞ্জনা নদীর তীরবর্তী উরুবিল্ব নামক স্থানে দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যায় মগ্ন থাকেন এবং নির্বাণ বা মুক্তিলাভের পথ আবিষ্কার করেন। সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর সিদ্ধার্থ বুদ্ধ (জ্ঞানী), বা তথাগত বা শাক্যমুনি নামেও পরিচিত হন। তিনি যে স্থানে সিদ্ধিলাভ করেন, পরবর্তীকালে তাহা বুদ্ধগয়া নামে খ্যাতিলাভ করে। তিনি যে বৃক্ষটির নীচে বসিয়া সিদ্ধিলাভ করেন তাহা বোধিদ্রুম নামে খ্যাত।

সিদ্ধিলাভ

সিদ্ধার্থ মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে সিদ্ধিলাভ করেন। সিদ্ধিলাভের পর তিনি মগধ, কোশল প্রভৃতি স্থানে আপন ধর্মমত প্রচার করেন। অবশ্য সিদ্ধিলাভের পর তিনি সর্বপ্রথম সারনাথের মৃগদাবে ধর্মমত প্রচার করেন।

ধর্মপ্রচার

বুদ্ধ গোরক্ষপুর জেলার কুশীনগরে ৮০ বৎসর বয়সে সম্ভবতঃ ৪৮৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে দেহত্যাগ করেন।

বুদ্ধের ধর্মমত ঃ বুদ্ধের ধর্মমত ছিল সহজ, সরল এবং অনাড়ম্বর। দুঃখ হইতে মুক্তিলাভই তাঁহার ধর্মমত প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি বলিতেন পার্থিব ভোগৈশ্বর্যে লিপ্ত থাকা অথবা কঠোর তপশ্চর্যায় লিপ্ত থাকা এবং কৃচ্ছ্রসাধন—দুইটির কোনটিই মুক্তিলাভের উপায় নহে। মধ্যম পন্থা অবলম্বন করিলে দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ সম্ভব। বৌদ্ধধর্মে কর্মফল এবং জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত। এই জন্মে সৎকার্য করিলে পরজন্মে উন্নততর জীবন যাপন সম্ভবপর। ক্রমাগত সৎকার্যে লিপ্ত থাকিলে শেষ পর্যন্ত নির্বাণ বা মুক্তিলাভ সম্ভবপর। কিন্তু অসৎকার্যে লিপ্ত থাকিলে বিপরীত ফললাভ হইবে।

নির্বানলাভের উপায়

বুদ্ধদেব নির্বাণ লাভের যে আটটি পন্থার নির্দেশ করিয়াছেন—সেইগুলি 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' নামে খ্যাত।

বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী ত্রিপিটক নামে খ্যাত। ত্রিপিটক বলিতে সূত্রপিটক, বিনয়পিটক এবং অভিধর্মপিটককে বুঝায়। জাতক বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য অংশ।

ত্রিপিটক

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রচারিত ধর্ম বিশ্বধর্মে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে এদেশে বৌদ্ধধর্ম **হীনযান** এবং **মহাযান**—এই দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের ফলে এবং বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিক ধর্মের প্রভাব দেখা দিলে ভারতে বৌদ্ধধর্ম দুর্বল হইয়া পড়ে।

অনুশীলনী

১। মহাবীর ও জৈনধর্ম সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
২। গৌতম বুদ্ধ এবং তাঁহার ধর্মমত সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
৩। টীকা লিখ :—(ক) দ্বাদশ অঙ্গ (খ) শ্বেতাম্বর, দিগম্বর (গ) ত্রিপিটক।

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

(ক) পার্শ্বনাথ কে ছিলেন? (খ) জৈনধর্মের কয় জন তীর্থংকর ছিলেন?
(গ) গৌতম বুদ্ধ যে স্থানে সিদ্ধিলাভ করেন সেই স্থানটির নাম কি?

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিম্বিসার হইতে অশোকের রাজত্বকালের ইতিহাস

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক হইতে ভারতের ধারাবাহিক রাজনৈতিক ইতিহাস জানিতে পারা যায়। ঐ সময়ে ষোলটি মহাজনপদ বা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল। ষোলটি রাজ্যের মধ্যে কোশল, অবন্তী, বৎস এবং মগধ ছিল প্রসিদ্ধ। কালক্রমে আর্যাবর্তে মগধের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিম্বিসার ঃ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বিম্বিসার মগধে রাজত্ব করিতেন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক। বিম্বিসারকে অনেকে সর্বপ্রথম ইতিহাস-স্বীকৃত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া থাকেন।

মগধের প্রাধান্যের সূচনা

তিনিই সর্বপ্রথম মগধের নেতৃত্বে আর্যাবর্তে একটি সুসংহত শাসন প্রবর্তন করিতে সচেষ্ট হন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং অশোক তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করেন।

বিম্বিসার আধিপত্য বিস্তারের জন্য তিনটি নীতির অনুসরণ করেন—ঐ তিনটি নীতি হইল বাহুবল, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন এবং বন্ধুত্ব স্থাপন।

তিনি বাহুবলের দ্বারা অঙ্গ রাজ্যের রাজাকে পরাজিত করিয়া পূর্বদিকে মগধের সীমা প্রসারিত করেন।

তিনি কোশলরাজ প্রসেনজিতের ভগিনীকে বিবাহ করিয়া যৌতুক হিসাবে কাশী রাজ্যের একাংশ লাভ করেন। বৈশালী রাজ্যের লিচ্ছবী বংশের প্রধানের কন্যাকে, বিদেহ রাজ্যের কন্যাকে এবং মদ্র রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া তিনি মগধের খ্যাতি বৃদ্ধি করেন।

প্রাধান্য বিস্তারের নীতি

বিম্বিসার তক্ষশীলা, অবন্তী প্রভৃতি রাজ্যের শাসকগণের সহিত

মৈত্রী স্থাপন করিয়া ঐ সকল রাজ্যের মধ্যে মগধের খ্যাতির প্রসার ঘটাইতে সক্ষম হন।

বিম্বিসার সুশাসক ছিলেন, সুশাসন প্রবর্তন করিয়া তিনি রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা করেন।

কথিত আছে যে বিম্বিসার তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু কর্তৃক নিহত হন।

অজাতশত্রু ঃ বিম্বিসারের পর রাজা হন অজাতশত্রু, কথিত আছে বিম্বিসার অজাতশত্রু কর্তৃক নিহত হইলে তাঁহার শোকে বিম্বিসারের পত্নী (কোশলরাজ্যের রাজকন্যা) প্রাণত্যাগ করেন। অতঃপর কোশলরাজ প্রসেনজিৎ শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে অজাতশত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন।

যুদ্ধে সাফল্য

কিন্তু প্রসেনজিৎ অজাতশত্রুর সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। কথিত আছে অজাতশত্রু রাজগৃহে রাজধানী স্থাপন করেন।

অজাতশত্রু বৈশালীর লিচ্ছবীগণকে এবং কুশীনগরের মল্লগণকে পরাজিত করেন।

অজাতশত্রুর পর যে কয়জন মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন তাহাদের মধ্যে উদয়ীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি রাজগৃহ হইতে পাটলীপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। উদয়ী অবন্তীরাজ্যের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন।

উদয়ী

উদয়ীর বংশধর নাগদাসকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া শিশুনাগ নূতন রাজবংশের শাসনের সূচনা করেন। তিনি অবন্তীরাজ্যের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সাফল্যলাভ করেন।

শিশুনাগ

নন্দবংশের শাসন ঃ শিশুনাগের বংশধর কাকবর্ণ বা কালাশোককে মহাপদ্মনন্দ নিহত করিয়া নন্দবংশের শাসনের সূত্রপাত করেন।

মহাপদ্মনন্দ প্রবল পরাক্রান্ত শাসক ছিলেন। তিনি ইক্ষাকু, কাশী, কোশল, কুন্তল, কলিঙ্গ জয় করেন। তিনি সম্ভবতঃ দক্ষিণ ভারতেও আধিপত্য বিস্তার করেন। মহাপদ্মনন্দ ছিলেন ভারতের **প্রথম সার্বভৌম সম্রাট।**

মহাপদ্মনন্দ

মৈত্রী স্থাপন করিয়া ঐ সকল রাজ্যের মধ্যে মগধের খ্যাতির প্রসার ঘটাইতে সক্ষম হন।

বিম্বিসার সুশাসক ছিলেন, সুশাসন প্রবর্তন করিয়া তিনি রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা করেন।

কথিত আছে যে বিম্বিসার তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু কর্তৃক নিহত হন।

অজাতশত্রু ঃ বিম্বিসারের পর রাজা হন অজাতশত্রু, কথিত আছে বিম্বিসার অজাতশত্রু কর্তৃক নিহত হইলে তাঁহার শোকে বিম্বিসারের পত্নী (কোশলরাজ্যের রাজকন্যা) প্রাণত্যাগ করেন। অতঃপর কোশলরাজ প্রসেনজিৎ শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে অজাতশত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন।

যুদ্ধে সাফল্য

কিন্তু প্রসেনজিৎ অজাতশত্রুর সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। কথিত আছে অজাতশত্রু রাজগৃহে রাজধানী স্থাপন করেন।

অজাতশত্রু বৈশালীর লিচ্ছবীগণকে এবং কুশীনগরের মল্লগণকে পরাজিত করেন।

অজাতশত্রুর পর যে কয়জন মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন তাহাদের মধ্যে উদয়ীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি রাজগৃহ হইতে পাটলীপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। উদয়ী অবন্তীরাজ্যের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন।

উদয়ী

উদয়ীর বংশধর নাগদাসকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া শিশুনাগ নূতন রাজবংশের শাসনের সূচনা করেন। তিনি অবন্তীরাজ্যের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সাফল্যলাভ করেন।

শিশুনাগ

নন্দবংশের শাসন ঃ শিশুনাগের বংশধর কাকবর্ণ বা কালাশোককে মহাপদ্মনন্দ নিহত করিয়া নন্দবংশের শাসনের সূত্রপাত করেন।

মহাপদ্মনন্দ প্রবল পরাক্রান্ত শাসক ছিলেন। তিনি ইক্ষাকু, কাশী, কোশল, কুন্তল, কলিঙ্গ জয় করেন। তিনি সম্ভবতঃ দক্ষিণ ভারতেও আধিপত্য বিস্তার করেন। মহাপদ্মনন্দ ছিলেন ভারতের **প্রথম সার্বভৌম সম্রাট**।

মহাপদ্মনন্দ

মহাপদ্মনন্দের মৃত্যুর পর তাঁহার আটটি পুত্র রাজত্ব করেন। ঐ বংশের শেষ নরপতি ধননন্দের সামরিক শক্তির বিষয়ে গ্রীক লেখকগণের রচনা হইতে জানা যায়। কথিত আছে ধননন্দের সামরিক শক্তির বিষয় জানিতে পারিয়া আলেকজাণ্ডার পূর্বদিকে অগ্রসর না হইয়া ভারত ত্যাগ করেন।

ধননন্দ

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নামক এক অসমসাহসী যুবক চাণক্য নামক তক্ষশীলা নিবাসী এক ব্রাহ্মণের সহায়তায় ধননন্দকে পরাজিত ও নিহত করিয়া নন্দবংশের শাসনের অবসান ঘটাইয়া মৌর্যবংশের শাসনের সূত্রপাত করেন।

আলেকজাণ্ডারের আগমন ঃ ধননন্দের রাজত্বকালে অর্থাৎ মৌর্যবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে গ্রীসের অন্তর্গত ম্যাসিডনের রাজা আলেকজাণ্ডার পারস্য জয় করিবার পর ৩২৭ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে ভারতে আগমন করেন। ঐ সময়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের অনৈক্য

আলেকজাণ্ডার

র‍া্যগুলির মধ্যে গান্ধারের পূর্বাংশে ছিল তক্ষশীলা রাজ্য, রাজা ...লেন অম্ভি। ঝিলম ও চেনাবের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ছিল পুরুর রাজ্য।

আলেকজাণ্ডার হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করিয়া পার্বত্য উপজাতি-দিগকে পরাজিত করিয়া তক্ষশীলায় উপস্থিত হন। রাজা অম্ভি

বিনা যুদ্ধে নতি স্বীকার করেন। কিন্তু আলেকজাণ্ডার পুরুর রাজ্য আক্রমণ করিলে পুরু প্রবলভাবে বাধাদান করেন। কিন্তু অসীম সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াও তিনি পরাজিত হন। কথিত আছে আলেকজাণ্ডার পুরুর বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া পুরুকে তাঁহার রাজ্য ফিরাইয়া দেন! অতঃপর আলেকজাণ্ডার বিপাশা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করেন। তাঁহার সৈন্যবাহিনী রণক্লান্ত হইয়া পড়ে। কথিত আছে যে পূর্ব ভারতের নন্দবংশীয় রাজা ধননন্দের সামরিক শক্তির বিষয় অবগত হইয়া তিনি ভারত ত্যাগ করেন।

পুরু কর্তৃক বাধাদান

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠা ঃ মৌর্যবংশের শাসনের সূত্রপাত করেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। মৌর্যশাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার পূর্বে চন্দ্রগুপ্ত আলেকজাণ্ডারের ভারত ত্যাগের পর পাঞ্জাব হইতে গ্রীকগণকে বিতাড়িত করিয়া আপন আধিপত্য বিস্তার করেন।

গ্রীক বিতাড়ন

আলেকজাণ্ডার অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য তাঁহার সেনাপতিগণের মধ্যে বিভক্ত হয়। আলেক-জাণ্ডারের অন্যতম সেনাপতি সেলুকস আলেকজাণ্ডার কর্তৃক পূর্বাঞ্চলের বিজিত ভূখণ্ডের অধিপতি হন। সেলুকস পাঞ্জাবে গ্রীকশাসন পুনঃ প্রবর্তন করিবার উদ্দেশ্যে সসৈন্যে আগমন করেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তকে তিনি পরাজিত করিতে পারেন নাই। কাবুল, কান্দাহার, হিরাট ও মকরান প্রদান করিয়া সেলুকস চন্দ্রগুপ্তের সহিত সন্ধি করেন। চন্দ্রগুপ্ত সেলুকসকে পাঁচশত হস্তী উপহার দেন। উভয় শাসকের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সেলুকস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থিনিস নামক একজন দূত প্রেরণ করেন। সেলুকসের নিকট হইতে কয়েকটি স্থান লাভ করার ফলে মৌর্য অধিকার পশ্চিমে পারস্য সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তারলাভ করে।

চন্দ্রগুপ্ত ও সেলুকস

মেগাস্থিনিস

চন্দ্রগুপ্ত প্রায় সমগ্র আর্যাবর্তে আপন আধিপত্য বিস্তার করেন। পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র কাথিয়াবাড় পর্যন্ত তাঁহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণে সম্ভবতঃ মহীশূর পর্যন্ত তাঁহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের আয়তন নন্দবংশীয়দের সাম্রাজ্য অপেক্ষা অধিক ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

রাজ্যসীমা

চন্দ্রগুপ্ত দেশে সুশাসন প্রবর্তন করিয়া শাসন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে সমর্থ হন। চন্দ্রগুপ্তের বিশাল সেনাবাহিনী ছিল। কথিত আছে তাঁহার ছয় লক্ষ পদাতিক, ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী, নয় সহস্র হস্তী এবং বহু রথ ছিল। তাঁহার একটি শক্তিশালী নৌবহরও ছিল।

কৃতিত্ব

কথিত আছে চন্দ্রগুপ্ত জৈনধর্ম গ্রহণ করেন। পরিণত বয়সে মহীশূরের অন্তর্গত শ্রবণ বেলগোলায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

বিন্দুসারঃ চন্দ্রগুপ্তের পর পুত্র বিন্দুসার মগধের অধিপতি হন। তিনি প্রায় পঁচিশ বৎসর রাজত্ব করেন। বিন্দুসারের রাজত্বকালে দক্ষিণ ভারতে মৌর্য আধিপত্য বিস্তারলাভ করে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সহিত পশ্চিম এশিয়ার বৈদেশিক শাসকগণের সহিত যে মৈত্রী স্থাপিত হয় বিন্দুসারের সময়ে তাহা অক্ষুণ্ণ থাকে। সিরিয়ার রাজা তাঁহার দরবারে একজন দূত প্রেরণ করেন। সম্ভবতঃ মিশরের রাজাও একজন দূত প্রেরণ করেন।

সাম্রাজ্যের মর্যাদা অক্ষুন্ন

অশোকঃ বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অশোক মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি আনুমানিক ২৭৩ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাহার চারি বৎসর পরে তাঁহার রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। কি কারণে সিংহাসনে আরোহণের চারি বৎসর পরে অভিষেক সম্পন্ন হয় তাহা সঠিকভাবে জানা যায় না। কোন কোন গ্রন্থে বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে উত্তরা-

সিংহাসনে আরোহণ

-ধিকার সংক্রান্ত বিরোধের যে উল্লেখ আছে, অনেকে তাহাকেই কারণ বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। অবশ্য উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধ সম্বন্ধে কোন সঠিক প্রমাণ নাই।

অশোক তাঁহার পিতামহ চন্দ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের নীতির অনুসরণ করেন। কলিঙ্গ রাজ্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়; কলিঙ্গ নন্দ-

অশোক

শাসনকালে মগধের শাসনাধীনে ছিল। কিন্তু মৌর্য শাসনকালে কলিঙ্গ শক্তিশালী, স্বাধীন রাজ্য হিসাবে পরিগণিত হয়।

অশোকের ত্রয়োদশ শিলালিপিতে কলিঙ্গ বিজয়ের বর্ণনা রহিয়াছে। ঐ বর্ণনা হইতে জানা যায় যে যুদ্ধে দেড় লক্ষ লোক

বন্দী, একলক্ষ নিহত ও গৃহহীন হয়। বহুলোক নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কলিঙ্গ বিজয়ের পর কলিঙ্গ মৌর্য সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে
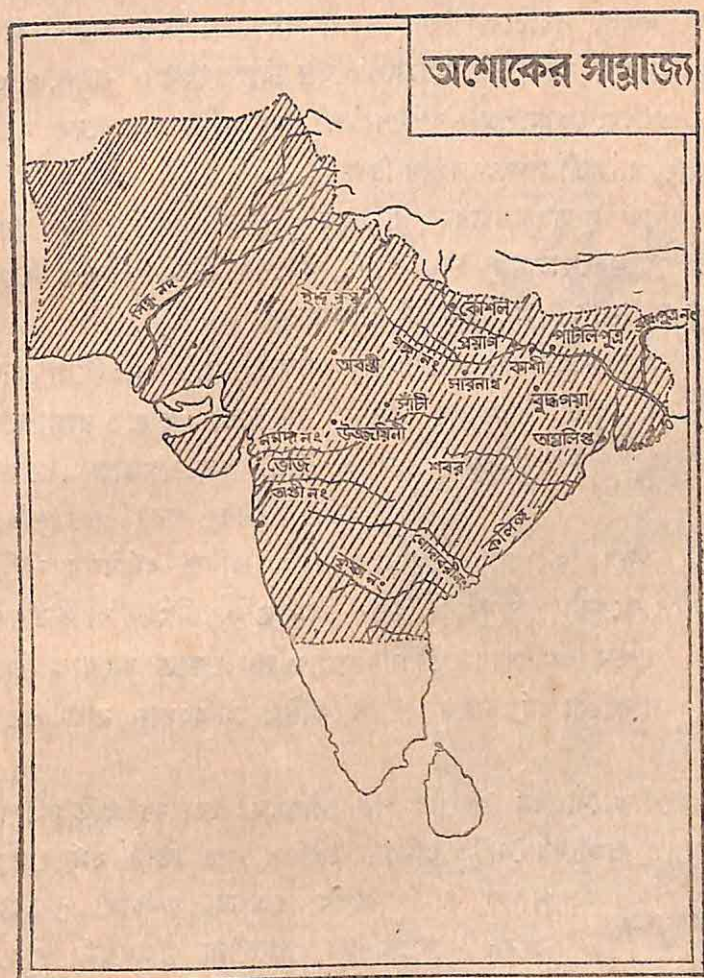
পরিণত হয়। পুরী জেলার অন্তর্গত তোসালী নগরে কলিঙ্গের নূতন রাজধানী স্থাপিত হয়।

কলিঙ্গ বিজয় মৌর্য সাম্রাজ্যের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহার ফলে আসমুদ্রহিমাচল মৌর্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বিম্বিসার

মগধের প্রসারের সূত্রপাত করেন, অশোক তাহা সম্পূর্ণ করেন।

সাম্রাজ্যের সীমা

অশোকের সাম্রাজ্য উত্তর পশ্চিমে আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান, উত্তরে কাশ্মীর এবং নেপালের তরাই অঞ্চল, পূর্বদিকে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ, পশ্চিমে আরব সাগর এবং দক্ষিণে মহীশূরের উত্তরাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র এবং কেরলপুত্র—দক্ষিণের এই রাজ্যগুলির রাজাদের সহিত অশোকের মৈত্রী সম্পর্ক বজায় ছিল।

কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম দেখিয়া অশোকের হৃদয়ে মর্মান্তিক অনুশোচনার উদয় হয়। অতঃপর তিনি উপগুপ্ত নামক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন।

কলিঙ্গ যুদ্ধের পর অশোকের পররাষ্ট্র নীতিতেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। অতঃপর তিনি বাহুবলের দ্বারা রাজ্যজয়ের

ধর্মবিজয়

পরিবর্তে প্রেম ও মৈত্রী দ্বারা অন্যান্য রাজ্যের শাসক এবং অধিবাসীদের হৃদয় জয় করিতে সচেষ্ট হন। অশোক অস্ত্রবিজয় ত্যাগ করিয়া ধর্মবিজয় নীতির অনুসরণ করেন। সুদূর দক্ষিণের রাজ্যগুলি, সিংহল বা তাম্রপর্ণী, এবং পশ্চিম এশিয়ার গ্রীক রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে অশোক সৈন্য প্রেরণ না করিয়া ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করিয়া অহিংসার বাণী প্রচার করেন।

অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পর বৌদ্ধধর্ম প্রচারের প্রতি দৃষ্টিদান করেন। প্রজাদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতির জন্য তিনি ধর্মমহামাত্র

ধর্মমহামাত্র

নামক এক বিশেষ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করেন। অশোকের প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম ভারতে সর্বত্র বিস্তারলাভ করে। কিন্তু তাহাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া তিনি

বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ

ভারতের বাহিরে মিত্ররাজ্য সমূহেও বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সুদূর দক্ষিণের চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র, সিংহল বা তাম্রপর্ণীতে তিনি ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেন। সিংহলে পুত্র বা ভ্রাতা মহেন্দ্র এবং কন্যা

সংঘমিত্রাকে প্রেরণ করেন। তিনি সম্ভবতঃ সুবর্ণভূমিতেও ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেন। সিরিয়া, গ্রীস, মিশর এবং উত্তর আফ্রিকার গ্রীক রাজ্যসমূহে তিনি ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেন।

তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীত

অশোকের রাজত্বকালে পাটলীপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতির অধিবেশন হয়। অশোকের প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম বিশ্বধর্মে পরিণত হয়।

অশোক স্তম্ভ

মঙ্গলজনক কার্যাবলী

অশোক প্রজাদের জন্য বিভিন্ন প্রকার মঙ্গলজনক কার্যগ্রহণ করেন। মনুষ্য ও জীবজন্তুদের জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। পথিকদের সুবিধার জন্য রাজপথ নির্মাণ, পথিপার্শ্বে কূপ খনন, বৃক্ষরোপণ প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন।

প্রজাদের পারলৌকিক মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিদান করেন। অশোকের এই সকল প্রচেষ্টা কেবলমাত্র নিজ সাম্রাজ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারত এবং ভারতের বাহিরের মিত্র রাজ্যসমূহেও ঐ নীতির অনুসরণ করেন।

মৌর্য শাসনকালে শিল্পের বিশেষ উন্নতি ঘটে। চন্দ্রগুপ্তের সময়ে কাষ্ঠনির্মিত প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রীক
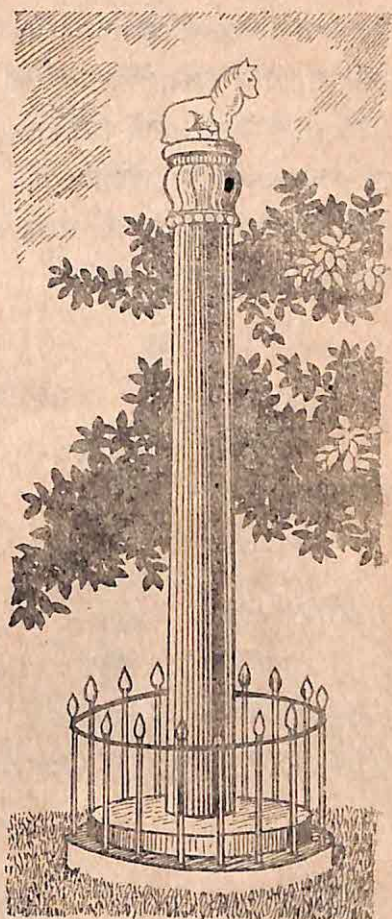
লেখকগণ মৌর্য প্রাসাদের শিল্পের প্রশংসা করিয়াছেন। অশোকের সময়ে কাষ্ঠের পরিবর্তে প্রস্তরের ব্যবহার শুরু হয়।

কথিত আছে অশোক ৮৪ হাজার বিহার নির্মাণ করেন। ঐগুলি শিল্পের উন্নতির পরিচায়ক।

অশোক কয়েকটি স্তূপের সংস্কার করেন এবং কয়েকটি স্তূপ নির্মাণ করেন, সাঁচী স্তূপ সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

অশোক সাম্রাজ্যের বিভিন্নস্থানে স্তম্ভ নির্মাণ করিয়া স্তম্ভগুলিতে ধর্মোপদেশ উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন।

ঐ সকল স্তম্ভের শীর্ষের পশুমূর্তিগুলি এবং স্তম্ভের পাদমূলের শিল্পকলা শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন।

অনুশীলনী

১। বিম্বিসারের আমল হইতে নন্দবংশের প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত মগধের ইতিহাস লিখ।

২। অশোকের রাজত্বকাল সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

মৌখিক প্রশ্ন :

(ক) আধিপত্য বিস্তারের জন্য বিম্বিসার কয়টি নীতির অনুসরণ করেন?

(খ) মেগাস্থিনিস কে ছিলেন?

(গ) কোন্ যুদ্ধের পর অশোকের পররাষ্ট্র নীতিতে পরিবর্তন ঘটে?

কণিষ্ক

অশোকের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন হয়। মৌর্যবংশের শাসনের অবসানের পর কোন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন না থাকায় ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে বৈদেশিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বৈদেশিক শক্তিসমূহের মধ্যে ব্যাকট্রিয়া হইতে আগত গ্রীকগণ, শক, পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ঐ সকল বৈদেশিক জাতিসমূহের মধ্যে কুষাণগণ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয়।

রাজনৈতিক অনৈক্য

কুষাণ শাসকগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন কণিষ্ক। কণিষ্কের রাজত্বকাল সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন প্রকার মতামত প্রকাশ করিয়াছেন।

কণিষ্ক

কণিষ্ক আপন সামরিক শক্তির বলে এক বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন। তাঁহার মুদ্রা বিহার এমন কি বঙ্গদেশেও পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ ঐ স্থান দুইটিতে তাঁহার প্রত্যক্ষ শাসন ছিল না, তবে কাশীতে যে তাঁহার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং কাশ্মীর তাঁহার শাসনাধীন ছিল। তাঁহার রাজধানী ছিল পুরুষপুর (বর্তমান পেশোয়ার)। আফগানিস্তান, ব্যাকট্রিয়া এবং মধ্য এশিয়ায় তাঁহার

কণিষ্কের অধীনস্থ ভূখণ্ড

অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। কাশগড়, ইয়ারখন্দ, খোটান প্রভৃতি স্থানসমূহ তিনি জয় করেন। কণিষ্ক চীনের সেনাপতি প্যান চাও এর নিকট যুদ্ধে পরাজিত হন। কিন্তু কিছুকাল পরে তিনি চৈনিক বাহিনীকে পরাজিত করেন। জনৈক চীনা রাজকুমারকে সন্ধির জামিন স্বরূপ তাঁহার রাজ্যে আটক করিয়া রাখেন। ভারতে বৈদেশিক শাসকগণের মধ্যে

চীনের বাহিনীর সহিত সংঘর্ষ

অপর কেহ রাজ্যবিস্তারে এতখানি কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন

নাই। তিনিই সর্বপ্রথম মধ্য এশিয়ায় ভারতের শাসন প্রসারিত করেন, ইতিপূর্বে শক্তিশালী মৌর্যগণও মধ্য এশিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন নাই।

বৌদ্ধধর্মে অনুরাগ

কণিষ্ক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি পুরুষপুরে বুদ্ধের দেহাবশেষের উপর এক বিশাল চৈত্য নির্মাণ করেন। চৈত্যটি কুষাণ যুগের শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন।

ঐ সময়ে বৌদ্ধধর্মে নানাপ্রকার অসংগতি দেখা দেওয়ায় কণিষ্ক বৌদ্ধধর্মে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য এক বৌদ্ধ সংগীতির আহ্বান করেন। কণিষ্কের আমলে কোন স্থানে চতুর্থ বা শেষ বৌদ্ধ সংগীতের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় তাহা আজিও সঠিক ভাবে জানা যায় নাই।

চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতি

ঐ সংগীতিতে কণিষ্ক বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখাকে সমর্থন করেন। ফলে মহাযান মত প্রবল আকার ধারণ করে। মহাযান মতে মূর্তিপূজা স্বীকৃত হওয়ায় শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। বৌদ্ধধর্মের অপর শাখা হীনযান দুর্বল হইয়া পড়ে।

কণিষ্ক বৌদ্ধধর্মে অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন।

পরধর্মসহিষ্ণুতা

তাঁহার মুদ্রায় হিন্দু, গ্রীক এবং পারসিক দেব-দেবীর মূর্তিও অঙ্কিত হইত।

কণিষ্কের শাসনকালে শিল্প ও সাহিত্যের অভাবনীয় উন্নতি ঘটে।

কণিষ্ক শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বৌদ্ধ পণ্ডিত বসুমিত্র, কবি ও দার্শনিক অশ্বঘোষ, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র প্রণেতা চরক, দার্শনিক নাগার্জুন প্রভৃতি তাঁহার রাজসভা অলংকৃত করিতেন।

শিল্প

কণিষ্কের আমলে শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়। পুরুষপুরের বিশাল চৈত্যটি ঐ যুগের শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। কণিষ্কের আমলে বহু স্তূপ ও বিহার নির্মিত হয়। মথুরায় কণিষ্কের যে ভগ্ন মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহা শিল্পের অমূল্য নিদর্শন।

কণিষ্ক একাধিক নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। কাশ্মীরে কণিষ্ক-পুরীর ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। অনেকের মতে কণিষ্ক ছিলেন ঐ নগরের প্রতিষ্ঠাতা।

অনুশীলনী

১। কুষাণ কাহারা? কুষাণগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক কে ছিলেন?
২। কণিষ্কের সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

মৌখিক প্রশ্ন:

(ক) কণিষ্ক কোন্ ধর্মে অনুরক্ত ছিলেন?
(খ) কণিষ্কের রাজধানীর নাম কি?
(গ) চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতি অধিবেশন কাহার রাজত্বকালে অনুষ্ঠিত হয়?
(ঘ) কুষাণ যুগের মনীষিগণের নাম উল্লেখ কর।

———

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত হইতে স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালের ইতিহাস

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে গুপ্তবংশীয় শাসকগণ একটি শক্তিশালী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনৈক্য এবং বিশৃঙ্খলা দূর করেন।

রাজনৈতিক অনৈক্য

গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্রীগুপ্ত। তিনি এবং তাঁহার পরবর্তী গুপ্তবংশীয় শাসকগণ সম্ভবতঃ স্বাধীন ছিলেন না। মগধ এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তাঁহাদের অধিকার সীমাবদ্ধ ছিল।

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ঃ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন গুপ্তবংশীয় শাসনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তিনি যে স্বাধীন শাসক ছিলেন সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তিনি সম্ভবতঃ ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐ সময়ে গুপ্তাব্দের প্রচলন হয়।

গুপ্তাব্দের প্রচলন

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবি বংশীয়া কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়া শক্তি বৃদ্ধি করেন। তাঁহার রাজধানী ছিল পাটলিপুত্রে।

সমুদ্রগুপ্ত ঃ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার মনোনয়ন অনুসারে কুমারদেবীর গর্ভজাত পুত্র সমুদ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অসাধারণ যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত গুপ্তবংশের তথা সমগ্র প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। দিগ্বিজয়ীরূপে তিনি অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেন। এলাহাবাদ-লিপি হইতে তাঁহার দিগ্বিজয় কাহিনী জানা যায়। রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্মা, গণপতিনাগ, নাগসেন, নন্দী প্রভৃতি-আর্যাবর্তের বিভিন্ন রাজ্যের শাসকগণ সমুদ্রগুপ্তের নিকট পরাজিত হন। তিনি মধ্য ভারতের আটবিক রাজ্য জয় করেন।

দিগ্বিজয়

দক্ষিণ ভারতের শাসকগণের মধ্যে মহেন্দ্র, বিষ্ণু গোপ, দমন,

স্বামীদত্ত, হস্তীবর্মন, উগ্রসেন, ধনঞ্জয় প্রভৃতি সমুদ্রগুপ্তের নিকট পরাজিত হন। সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে না রাখিয়া রাজ্যগুলি পূর্বের শাসকদের অধীনে স্থাপন করেন।

সমুদ্রগুপ্ত
(বীণাবাদনের মূর্তি)

অন্যান্য রাজ্যসমূহ কর্তৃক নতিস্বীকার

অতঃপর ভীত হইয়া নেপাল, কর্তৃপুর, সমতট, কামরূপ, ডবাক, মালব, যৌধেয়, প্রার্জুন, অর্জুনায়ন প্রভৃতি রাজ্যগুলি এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের শক এবং কুষাণদের বংশধরগণ স্বেচ্ছায় সমুদ্রগুপ্তের নিকট নতি স্বীকার করে। সিংহল-রাজ মেঘবর্মার সহিত তাঁহার মিত্রতা ছিল।

অশ্বমেধ যজ্ঞ

দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ করিয়া সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক হইলেও সমুদ্রগুপ্ত বৌদ্ধধর্মদ্বেষী ছিলেন না। সমুদ্রগুপ্ত কবি এবং সংগীতশিল্পীও ছিলেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ঃ সমুদ্রগুপ্তের পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অনেকে তাঁহাকে কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। তিনি শকদিগকে পরাজিত করেন, সম্ভবতঃ উজ্জয়িনী তাঁহার দ্বিতীয় রাজধানী ছিল এবং কালিদাস সম্ভবতঃ তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন।

রাজ্যবিস্তার

তিনি শকদিগকে পরাজিত করিয়া মালব এবং সুরাষ্ট্র জয় করিয়া আরব সাগর পর্যন্ত সাম্রাজ্যের সীমা প্রসারিত করেন। তিনি বাকটক বংশীয় শাসকের সহিত কন্যা প্রভাবতীর বিবাহ দিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং নাগবংশীয়া কুমার

নাগাকে বিবাহ করেন। তিনি এই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া শক্তিবৃদ্ধি করিতে চাহিয়াছিলেন।

কৃতিত্ব
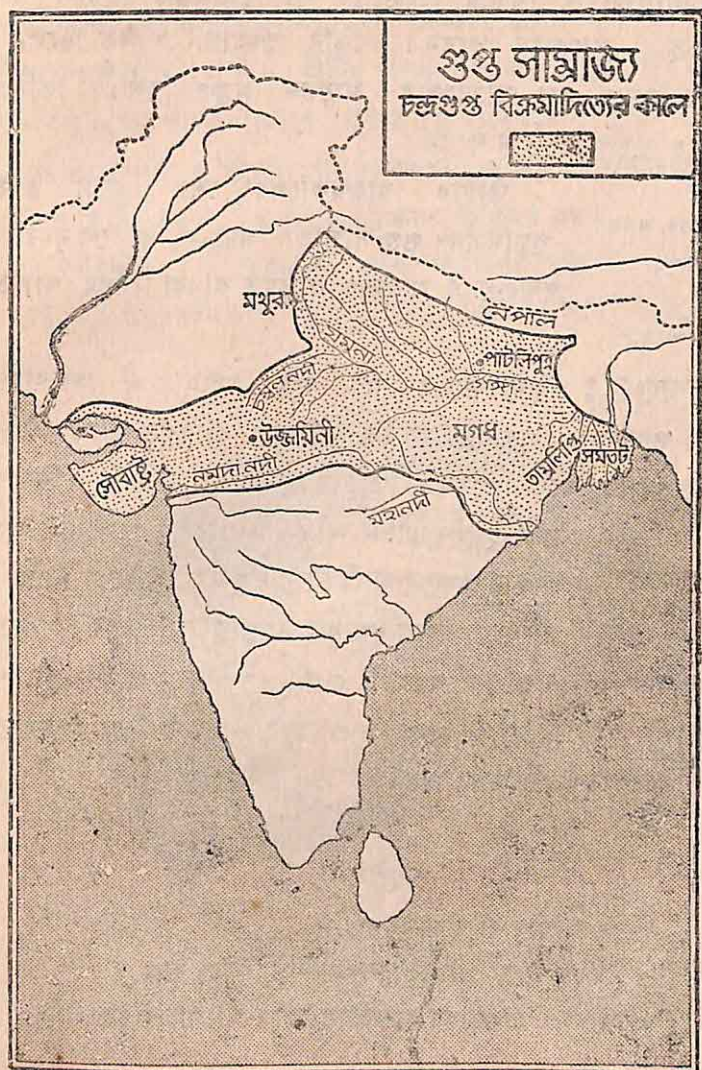
দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিদ্বান ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কবি বীরসেন তাঁহার সভাকবি ছিলেন। কবি **কালিদাস** সম্ভবতঃ তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন।

তাঁহার আমলে দেশে সুশাসন বজায় ছিল। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত ছিল।

কুমারগুপ্ত ঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর কুমারগুপ্ত পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সুযোগ্য শাসক ছিলেন। তাঁহার সময়ে গুপ্ত সাম্রাজ্যের আয়তন অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনিও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

সাম্রাজ্যের আয়তন অক্ষুন্ন

তাঁহার রাজত্বকালের শেষ ভাগে দুর্ধর্ষ পুষ্যমিত্রগণ গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করিলে যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত ঐ আক্রমণ প্রতিহত করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

স্কন্দগুপ্ত ঃ কুমারগুপ্তের পর গুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন স্কন্দগুপ্ত। পুষ্যমিত্র জাতির আক্রমণ প্রতিহত করিয়া তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার রাজত্বকালে মধ্য এশিয়ার

হূন আক্রমণের প্রতিরোধ

দুর্ধর্ষ হূনগণ এদেশ আক্রমণ করিয়া কাপিসা এবং গান্ধার অঞ্চলে স্থায়িভাবে বসবাস করিতে থাকে। স্কন্দগুপ্ত তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করিতে পারেন নাই। স্কন্দগুপ্তের পরবর্তী গুপ্তরাজগণ দুর্বল থাকায় হূনগণ শক্তিশালী হইয়া উঠে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর পুনরায় অনৈক্য এবং বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

অনুশীলনী

১। সমুদ্রগুপ্ত সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্তের শাসনকাল সম্বন্ধে আলোচনা কর।

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

(ক) সমুদ্রগুপ্ত কোন্ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন?

(খ) গুপ্তবংশীয় কোন্ শাসককে কিংবদন্তীর 'বিক্রমাদিত্য' বলা হয়?

———

হর্ষের সময় হইতে মহেন্দ্রপালের রাজত্বকাল

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর হূন জাতির আক্রমণ এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা পুনরায় দেখা দেয়। কিন্তু ঐ অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের শেষে অথবা ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগে পাঞ্জাবের পূর্ব প্রান্তে থানেশ্বরে পুষ্যভূতি বংশীয়গণ একটি শক্তিশালী শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে রাজনৈতিক ঐক্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত হয়।

হর্ষবর্ধন: থানেশ্বররাজ প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্ধন রাজা হন। প্রভাকরবর্ধনের জামাতা কনৌজের

হর্ষবর্ধন

মৌখরী বংশীয় শাসক গ্রহবর্মা মালবরাজ দেবগুপ্তের দ্বারা নিহত হন।

সিংহাসনে আরোহণ

রাজ্যবর্ধনও মালবরাজ দেবগুপ্ত এবং বাংলার (গৌড়ের) শশাঙ্কের শত্রুতার ফলে নিহত হন। গ্রহবর্মার পত্নী রাজ্যশ্রী বন্দিনী হন। এইরূপ পরিস্থিতিতে ৬০৬

খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন থানেশ্বর এবং কনৌজের অমাত্যদের অনুরোধে কনৌজের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কনৌজে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়। হর্ষ বহু কষ্টে রাজ্যশ্রীকে বিন্ধ্যপর্বতের অরণ্যাঞ্চল হইতে উদ্ধার করেন।

হর্ষ কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। শশাঙ্কের বিরুদ্ধে তিনি কতখানি সাফল্য লাভ করেন তাহা জানা যায় না। সম্ভবতঃ শশাঙ্ক যতকাল জীবিত ছিলেন ততদিন স্বাধীন ছিলেন। সম্ভবতঃ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হর্ষ মগধ এবং ভাস্করবর্মা কঙ্গোদ জয় করেন।

হর্ষ ও শশাঙ্ক

হর্ষ বাহুবলে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি সুরাষ্ট্রের বা কাথিয়াওয়াড়ের অন্তর্গত বলভী রাজ্যের শাসক ধ্রুবসেনকে পরাজিত করেন এবং তাঁহার সহিত কন্যা প্রভাবতীর বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দাক্ষিণাত্য জয়ের পরিকল্পনা চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর পরাক্রমের ফলে ব্যর্থ হইয়া যায়। হর্ষ নর্মদা নদীর দক্ষিণ তীরে প্রভাব বিস্তার করিতে ব্যর্থ হন।

রাজ্যবিস্তার

হর্ষ সুশাসক ছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ হর্ষের শাসনকালের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে সুশাসনের অস্তিত্বের উল্লেখ আছে। হর্ষ চীন সম্রাটের দরবারে একজন দূত প্রেরণ করেন, চীন হইতেও একটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল এদেশে আগমন করে।

সুশাসন

হর্ষের রাজত্বকালে সাহিত্যের উন্নতি হয়। 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিত' রচনা করেন বাণভট্ট। কথিত আছে হর্ষ স্বয়ং 'রত্নাবলী', 'প্রিয়দর্শিকা' এবং 'নাগানন্দ' নামক তিনটি নাটক রচনা করেন। শিক্ষাকেন্দ্র রূপে নালন্দার খ্যাতি ছিল। হর্ষ নালন্দার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

সাহিত্যের উন্নতি

হর্ষ প্রথমে ছিলেন শৈব, পরে বৌদ্ধ-ধর্মে অনুরক্ত হইয়া পড়েন। তিনিও অশোকের ন্যায় দাতব্য চিকিৎসালয়, বিশ্রামাগার স্থাপন প্রভৃতি জনহিতকর কার্যাবলী গ্রহণ করেন।

ধর্ম

হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর পুনরায় অনৈক্য এবং বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বিভিন্ন রাজবংশের মধ্যে উত্তর ভারতে প্রাধান্য বিস্তারের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রপাত হয়। গুর্জর-প্রতিহারগণ সর্বপ্রথম সাফল্যলাভ করিয়া আধিপত্য বিস্তার করেন।

হর্ষের পর অনৈক্য

প্রতিহার বংশীয় প্রথম নাগভট্ট সিন্ধুর আরবদিগকে পরাজিত করেন। ঐ বংশীয় **বৎসরাজ** বাংলার শাসক ধর্মপালকে পরাজিত করেন কিন্তু দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের নিকট পরাজিত হন। তাঁহার পুত্র **দ্বিতীয় নাগভট্ট** ধর্মপাল এবং তাঁহার আশ্রিত কনৌজের চক্রায়ুধকে পরাজিত করেন। কিন্তু স্বয়ং রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দের নিকট পরাজয় বরণ করেন।

গুর্জর-প্রতিহারগণের সাফল্য

তাঁহার পুত্র **মিহিরভোজ** রাষ্ট্রকূটরাজকে ও পালরাজকে পরাজিত করেন। মালব, সুরাষ্ট্র, পাঞ্জাব, অযোধ্যা প্রভৃতি তাঁহার শাসনাধীন ছিল। আরব দেশীয় পর্যটক সুলেমান তাঁহার সামরিক শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন।

মিহিরভোজের সাফল্য

পরবর্তী শাসক ছিলেন **মহেন্দ্রপাল**, তাঁহার সময়ে প্রতিহার সাম্রাজ্যের সীমা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। তিনি মগধ জয় করেন। উত্তর বঙ্গও তাঁহার অধিকারে ছিল। কাথিয়াওয়াড় হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ড তাঁহার শাসনাধীন ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর কনৌজের পতনের সূত্রপাত হয়।

মহেন্দ্রপালের কৃতিত্ব

অনুশীলনী

১। হর্ষবর্ধনের সম্বন্ধে আলোচনা কর।

২। হর্ষের আমল হইতে প্রতিহার মহেন্দ্রপালের রাজত্বকালের ইতিহাস লিখ।

৩। **টীকা লিখঃ** (ক) মিহিরভোজ, (খ) মহেন্দ্রপাল।

শশাঙ্কের আমল হইতে দেবপালের রাজত্বকাল

শশাঙ্ক ঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর বাংলার 'গুপ্ত' উপাধিধারী শাসকগণ কনৌজের মৌখরী এবং দক্ষিণ ভারতের চালুক্যদের আক্রমণে দুর্বল হইয়া পড়িলে শশাঙ্ক বাংলায় একটি স্বাধীন, শক্তিশালী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

শশাঙ্কের বাল্যকাল সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁহাকে গুপ্তবংশীয় বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে শশাঙ্কের প্রকৃত নাম ছিল নরেন্দ্র গুপ্ত। কিন্তু ঐ মতের সমর্থনে কোন প্রমাণ নাই। শশাঙ্ক সম্ভবতঃ প্রথম জীবনে গুপ্তবংশীয় মহাসেন গুপ্তের অধীনে সামন্ত ছিলেন। ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে তিনি একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার রাজধানী ছিল **কর্ণসুবর্ণ**।

পরিচিতি

শশাঙ্ক বাহুবলে রাজ্যবিস্তার করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি দণ্ডভুক্তি, কঙ্গোদ এবং উৎকল জয় করেন। তিনি মগধ জয় করেন এবং বারাণসী পর্যন্ত অগ্রসর হন। দক্ষিণ বঙ্গের বঙ্গ রাজ্য সম্ভবতঃ তাঁহার অধীন ছিল।

রাজ্যবিস্তার

শশাঙ্কের সহিত মৌখরী গ্রহবর্মার শত্রুতা ছিল। শশাঙ্ক গ্রহবর্মার শত্রু মালবরাজ দেবগুপ্তের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। গ্রহবর্মা দেবগুপ্ত কর্তৃক নিহত হন। গ্রহবর্মা ছিলেন থানেশ্বররাজ প্রভাকরবর্ধনের জামাতা। প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দেবগুপ্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া দেবগুপ্তকে নিহত করেন। রাজ্যবর্ধন শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া নিহত হন।

শশাঙ্ক ও রাজ্যবর্ধন

রাজ্যবর্ধন এবং গ্রহবর্মার মৃত্যুর পর থানেশ্বর এবং কনৌজের সিংহাসন শূন্য হওয়ায় রাজ্যবর্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন উভয়

রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কামরূপরাজ ভাস্করবর্মনের সহিত তিনি মৈত্রী স্থাপন করিয়া যুদ্ধযাত্রা করেন। যুদ্ধে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে কতখানি সাফল্য অর্জন করেন তাহা জানা যায় না। সম্ভবতঃ শশাঙ্ক আমৃত্যু স্বাধীন ছিলেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হর্ষ কঙ্গোদ এবং ভাস্করবর্মা কর্ণসুবর্ণ জয় করেন। শশাঙ্ক বাংলাকে আর্যাবর্তের অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করেন।

শশাঙ্ক ও হর্ষ

পাল শাসনের সূচনা ঃ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলায় পুনরায় অনৈক্য অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বাংলায় **'মাৎস্যন্যায়'**-এর অবস্থা চলিতে থাকে। অষ্টম শতকের মধ্যভাগে ঐ অবস্থা হইতে মুক্তিলাভের জন্য বাংলার প্রাচীন নেতৃবৃন্দ **গোপাল** নামক এক ব্যক্তিকে রাজা নির্বাচিত করায় বাংলায় পালবংশের প্রতিষ্ঠা হয়।

গোপাল

গোপাল সমগ্র বঙ্গদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়া স্বেচ্ছাচারী সামন্তদিগকে দমন করেন। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

ধর্মপাল ঃ গোপালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ধর্মপাল বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সমগ্র আর্যাবর্তে বাংলার প্রাধান্য বিস্তার করিতে সচেষ্ট হন। ফলে গুর্জর-প্রতিহার এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটবংশীয় শাসকগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হন। তিনি উত্তর ভারতে প্রাধান্য বিস্তার করিবার জন্য অগ্রসর হইলে গুর্জর-প্রতিহার শাসক বৎসরাজ কর্তৃক পরাজিত হন। কিন্তু বৎসরাজও দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূট-রাজ ধ্রুব কর্তৃক পরাজিত হন। ধ্রুব এবং বৎসরাজের মধ্যে সংঘর্ষের সুযোগে ধর্মপাল মগধ, বারাণসী জয় করেন। কিন্তু ধর্মপাল ধ্রুব কর্তৃক পরাজিত হন। ধ্রুব দক্ষিণ ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলে ধর্মপাল পুনরায় রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করেন। তিনি কনৌজের শাসক ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত এবং বিতাড়িত করিয়া তাঁহার আশ্রিত চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসনে

রাজ্যবিস্তার ও ত্রি-শক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতা

প্রতিষ্ঠিত করেন। চক্রায়ুধের অভিষেককালে ভোজ, মৎস, মদ্র, কুরু, যবন, অবন্তি, গান্ধার প্রভৃতি রাজ্যের শাসকগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের উপস্থিতিকে অনেক ঐতিহাসিক ধর্মপালের প্রতি তাঁহাদের আনুগত্যের নিদর্শন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্ট কিছুকাল পরেই কনৌজ হইতে চক্রায়ুধকে বিতাড়িত করেন। দ্বিতীয় নাগভট্টের নিকট ধর্মপাল এবং চক্রায়ুধ উভয়েই পরাজিত হন। কিন্তু দ্বিতীয় নাগভট্ট রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের নিকট পরাজিত হন। ধর্মপাল এবং চক্রায়ুধ তৃতীয় গোবিন্দের নিকট নতি স্বীকার করেন। গোবিন্দ স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিলে ধর্মপাল পুনরায় আধিপত্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। আমৃত্যু আর্যাবর্তে তাঁহার প্রাধান্য বজায় ছিল।

ধর্মপাল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি বিক্রমশীলা মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেন।

দেবপাল ঃ ধর্মপালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দেবপাল পালসিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন পালবংশের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শাসক। তিনি আধিপত্য বিস্তারে আগ্রহী ছিলেন।

তিনি আসামের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। অহোমরাজ বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করিয়া দেবপালের সামন্তরূপে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন।

দেবপালের সেনাবাহিনী উড়িষ্যা জয় করে। দেবপালের নিকট প্রতিহাররাজ ভোজ এবং রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষ পরাজিত হন। কথিত আছে যে দেবপালের সেনাবাহিনী সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত অগ্রসর হয়। দেবপালের নিকট জনৈক হূন শাসক পরাজিত হন। দেবপাল তাঁহার সামরিক প্রতিভা-বলে সমগ্র আর্যাবর্তে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন। দেবপালের রাজত্বকালে পাল সাম্রাজ্য চরম বিস্তৃতিলাভ করে।

রাজ্যবিস্তার

আরব দেশীয় পর্যটক সুলেমান দেবপালের সামরিক শক্তির বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ভারতের বাহিরেও দেবপালের খ্যাতি প্রসার লাভ করে। সুবর্ণভূমির অধিপতি বালপুত্রদেব নালন্দায় মঠ নির্মাণের জন্য দেবপালের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। দেবপাল নালন্দায় মঠ নির্মাণের অনুমতিদান করিয়া তাহার ব্যয়-নির্বাহের জন্য পাঁচখানি গ্রাম দান করেন।

খ্যাতির প্রসার

দেবপাল বৌদ্ধধর্মে অনুরক্ত ছিলেন। তিনি নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়েরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তিনি স্বয়ং একটি মঠ নির্মাণ করেন।

অনুশীলনী

১। শশাঙ্কের সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
২। ধর্মপাল সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
৩। দেবপাল সম্বন্ধে আলোচনা কর।

মৌখিক প্রশ্ন :

(ক) শশাঙ্ক কোন্ ধর্মে অনুরাগী ছিলেন?
(খ) 'মাৎস্যন্যায়' কাহাকে বলে?
(গ) পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?
(ঘ) দেবপালের নিকট নালন্দায় কে মঠ নির্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করেন?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অর্থশাস্ত্র, মেগাস্থিনিস, ফা-হিয়েন এবং হিউয়েন সাঙের বিবরণ অনুসারে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস

অর্থশাস্ত্র, মেগাস্থিনিস, ফা-হিয়েন এবং হিউয়েন সাঙের বিবরণ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার অমূল্য উপাদান হিসাবে স্বীকৃতি-লাভ করিয়াছে। ঐ সকল সূত্রের প্রধান দুইটি হইতে মৌর্য যুগের, তৃতীয়টি হইতে গুপ্তযুগের এবং সর্বশেষটি হইতে হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালের বিবরণ জানা যায়। রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বহু বিষয় জানিতে পারা যায়। নিম্নে ঐ সকল সূত্রগুলির প্রত্যেকটির পৃথক্ পৃথক্ আলোচনা করা হইল :—

সূত্রগুলির গুরুত্ব

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ঃ মৌর্যযুগ তথা সমগ্র প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার অমূল্য উপাদান হিসাবে অর্থশাস্ত্র পরিচিত। অর্থশাস্ত্র কৌটিল্য কর্তৃক রচিত বলিয়া অনুমিত হয়। মৌর্য শাসনের প্রতিষ্ঠার সময় ধননন্দের বিরুদ্ধে চন্দ্রগুপ্তকে চাণক্য, বিষ্ণুগুপ্ত বা কৌটিল্য নামক জনৈক তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ যথেষ্ট সাহায্য করেন। অনেকের মতে ঐ ব্যক্তিই অর্থশাস্ত্র রচনা করেন। সংস্কৃত সাহিত্যে অর্থশাস্ত্র নামক গ্রন্থের উল্লেখ আছে। কিছুকাল পূর্বে অর্থশাস্ত্র নামক একটি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে—অনেকে মনে করেন ঐ গ্রন্থটিই কৌটিল্য রচিত বিখ্যাত অর্থশাস্ত্র নামক গ্রন্থ। আবার কাহারও মতে উহা চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কৌটিল্যের রচনা নহে, কারণ ঐ গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত, কিন্তু মৌর্য যুগে পালি ভাষার অধিক প্রচলন ছিল। দ্বিতীয়তঃ অর্থশাস্ত্রে একটি ক্ষুদ্ররাজ্যের শাসন ব্যবস্থার বর্ণনা রহিয়াছে। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত একটি বিশাল ভূখণ্ডের অধিপতি

রচনাকাল সম্বন্ধে মতবিরোধ

সমাজচিত্র

ছিলেন। অর্থশাস্ত্রে চীনের সঙ্গে ব্যবসায়ের পরোক্ষ উল্লেখ আছে। কিন্তু মৌর্যযুগের পরবর্তী কালে চীনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়, সেইজন্য অনেকে অর্থশাস্ত্রকে মৌর্যযুগের পরবর্তী কালের রচনা বলিয়া অনুমান করেন। অর্থশাস্ত্রের বর্ণনার সহিত অনেক ক্ষেত্রে গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের বর্ণনার সাদৃশ্য দেখা যায় না।

অর্থশাস্ত্রে প্রধানতঃ রাজতন্ত্র-শাসিত শাসন-ব্যবস্থার উল্লেখ আছে, জনসাধারণের অবস্থা, সামাজিক আচার-ব্যবহার প্রভৃতিরও আলোচনা রহিয়াছে।

নারীর স্থান

অর্থশাস্ত্রে সমাজে নারীর স্থান সম্পর্কে আলোচনা রহিয়াছে। নারীগণ অভিভাবকের নিকট থাকিতেন। বিবাহের পূর্বে পিতা এবং পরে স্বামী অভিভাবক হইতেন। অর্থশাস্ত্রে নারীদের কোন্ বয়সে বিবাহ হইবে তাহার উল্লেখ নাই। অবশ্য অর্থশাস্ত্রে নারী এবং পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই বিবাহকে অবশ্যকর্তব্য বলা হইয়াছে।

বর্ণভেদ

সমাজে বর্ণভেদ বা জাতিভেদ প্রথা কঠোর ছিল, অর্থশাস্ত্রে দুই-জাতিভুক্ত নরনারীর বিবাহের নিন্দা করা হইয়াছে।

বিবাহের প্রকার ভেদ

অর্থশাস্ত্রে আট প্রকারের বিবাহের উল্লেখ করা হইয়াছে—তাহাদের কোনটিকেও নিন্দা করা হয় নাই। অর্থশাস্ত্রে নারী ও পুরুষ উভয়ের পুনর্বিবাহের সমর্থন রহিয়াছে। কোন পুত্রসন্তান না জন্মিলে বা নিঃসন্তান থাকিলে পুনরায় বিবাহে কোন বাধা ছিল না। নারীগণও অনুরূপ অবস্থায় পুনরায় বিবাহ করিতে পারিতেন।

অর্থশাস্ত্রে বহু বিবাহ প্রথার উল্লেখ আছে। কিন্তু নারীর পক্ষে একই সময়ে একাধিক ব্যক্তিকে স্বামীত্বে বরণ করা নিষিদ্ধ ছিল।

বিবাহ বিচ্ছেদ

অর্থশাস্ত্রে বিবাহ বিচ্ছেদেরও উল্লেখ রহিয়াছে। অর্থশাস্ত্র রচয়িতার মতে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে শত্রুতা সম্পর্ক দেখা দিলে বিবাহ বিচ্ছেদ সমর্থিত হইত।

নানা সূত্রে মৌর্য যুগের ধনী সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার বিষয় জানা গিয়াছে। তাঁহারা সাধারণতঃ ছিলেন নগরবাসী। দেহচর্চা এবং দেহের শ্রীবৃদ্ধির প্রতি তাঁহাদের সজাগ দৃষ্টি ছিল। চাউল, গম, যব, দুগ্ধ, মাংস প্রভৃতি তাহাদের প্রধান খাদ্য হইলেও মদ্যপানের বহুল প্রচলন ছিল। অর্থশাস্ত্রে মদ্যপান নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধিনিষেধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

ধনীদের জীবনযাত্রা

মেগাস্থিনিসের বিবরণ ঃ মৌর্যবংশের শাসনের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য পাঞ্জাব হইতে গ্রীকগণকে বিতাড়িত করেন। সিরিয়ার অধিপতি এবং আলেকজাণ্ডারের অন্যতম সেনাপতি সেলুকস পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীকশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে আগমন করেন, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের সহিত তাঁহার সন্ধি হয়। ঐ সন্ধির পর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করিবার উদ্দেশ্যে সেলুকস চন্দ্রগুপ্তের দরবারে মেগাস্থিনিস নামক জনৈক গ্রীককে দূতরূপে প্রেরণ করেন। মেগাস্থিনিস দীর্ঘদিন এদেশে অবস্থান করেন।

মেগাস্থিনিস এদেশে অবস্থান করিবার পর ভারত সম্বন্ধে 'ইণ্ডিকা' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ 'ইণ্ডিকার' সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পরবর্তী কালে গ্রীক এবং লাতিন লেখকগণের রচনায় উদ্ধৃত অংশ হিসাবে মেগাস্থিনিসের রচনার অংশ বিশেষ জানা যায়।

'ইণ্ডিকা'

মেগাস্থিনিস রাজা, পাটলিপুত্র নগরী, রাজপ্রাসাদ, পৌরশাসন ব্যবস্থা, জনপদসমূহের শাসন-ব্যবস্থা, সামরিক বিভাগ, সামাজিক বিভাগ, সমাজচিত্র, ভারতবাসীদের নৈতিক চরিত্র, শিক্ষা, দণ্ডবিধি এবং অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন।

মেগাস্থিনিস মৌর্যযুগে ভারতীয় সমাজ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে সমাজ সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।

দার্শনিকগণ ছিলেন সমাজের সর্বোচ্চ শ্রেণী। ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণগণ ছিলেন দার্শনিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাঁহারা করদানে অব্যাহতি লাভ করিতেন।

কৃষকগণ রাষ্ট্রের সকল দায়িত্বভার হইতে মুক্ত ছিল। সৈন্যবাহিনীতেও তাহাদের যোগদান করিতে হইত না। তাহাদের প্রধান দায়িত্ব ছিল ফসল উৎপাদন করা। কৃষকগণ রাজাকে খাজনা এবং সময়ে সময়ে উপহার দিত।

পশুপালকগণ সম্ভবতঃ নগরে বা গ্রামে স্থায়িভাবে বসবাস করিত না।

শিল্পিগণঃ যুদ্ধাস্ত্র এবং কৃষির জন্য যন্ত্রপাতি নির্মাণই ছিল তাহাদের প্রধান কর্তব্য। রাজকোষ হইতে শিল্পীদের ভরণপোষণের জন্য অর্থ দেওয়া হইত।

সৈনিকগণঃ তাহারা সংখ্যায় নগণ্য ছিল না। তাহাদের পেশা ছিল যুদ্ধ করা।

পরিদর্শকগণঃ রাষ্ট্রের সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া রাজা বা রাজকর্মচারীদিগকে জানানো ছিল তাহাদের কর্তব্য।

অমাত্যঃ তাঁহারা ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী। সেনাপতি, জেলাশাসকগণ এই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন।

মেগাস্থিনিসের মতে ঐ শ্রেণীভেদ খুব কঠোরভাবে অনুসরণ করা হইত। সৈনিকের পক্ষে কৃষক, শিল্পী অথবা দার্শনিক শ্রেণীভুক্ত হওয়া সম্ভবপর ছিল না।

নৈতিক চরিত্র

মেগাস্থিনিস ভারতীয় সমাজের যে বিভাগের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা যথার্থ নহে, তৎকালীন হিন্দু সমাজের জাতিভেদের সহিত কোন সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় নাই। মেগাস্থিনিস বৃত্তির ভিত্তিতে সামাজিক বিভাগের উল্লেখ করিয়াছিলেন।

মেগাস্থিনিস লিখিয়াছেন যে ভারতবাসিগণ সরল এবং অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিত। মেগাস্থিনিস ভারতীয়দের নৈতিক চরিত্রের প্রশংসা করিয়াছেন। চুরি, ডাকাতি, বিরোধ প্রায় ছিলই না। ভারতীয়গণ ধর্মানুষ্ঠান বা উৎসব ব্যতীত মদ্যপান করিত না।

মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন যে এদেশে দাসত্বপ্রথার অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু মেগাস্থিনিসের ঐ উক্তি যথার্থ নহে। কারণ অর্থশাস্ত্রে এবং মৌর্য সম্রাট্ অশোকের লিপিতে দাস প্রথার অস্তিত্বের উল্লেখ রহিয়াছে। সম্ভবতঃ গ্রীস বা অন্যান্য দেশে দাসপ্রথা যেরূপ কঠোর ছিল এদেশে সেই কঠোরতা ছিল না। দাসপ্রথার কঠোরতা না থাকায় মেগাস্থিনিস দাসপ্রথার অস্তিত্ব ছিল কিনা বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার মতে দেশে দুর্ভিক্ষও পরিলক্ষিত হইত না।

দাসপ্রথা

মেগাস্থিনিসের মতে ঐ যুগে শিল্প ও কলা উন্নত ছিল। কাষ্ঠ-নির্মিত গৃহগুলি ছিল শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। অলংকার নির্মাণে শিল্পিগণ নিযুক্ত থাকিতেন অলংকার পরিধানেরও প্রচলন ছিল।

শিল্পকলা

ভারতীয়গণ লিখিতে বা পড়িতে পারিত না বলিয়া মেগাস্থিনিস যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহাও সম্পূর্ণ সত্য নহে, বিদ্যার বহুল চর্চা সম্ভবতঃ ছিল না।

ফা-হিয়েনের বিবরণ ঃ গুপ্তসম্রাট্ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব-কালে ফা-হিয়েন নামক জনৈক চৈনিক পরিব্রাজক এদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ এবং বৌদ্ধ তীর্থস্থানসমূহ পরিদর্শন করিবার জন্য তিনি ভারতে আগমন করেন। ফা-হিয়েন এদেশে চৌদ্দ বৎসরের অধিক সময় অবস্থান করেন। এদেশের বিভিন্ন বৌদ্ধ তীর্থকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন। ৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক) বন্দর হইতে জলপথে তিনি স্বদেশ যাত্রা করেন।

পরিচিতি

ফা-হিয়েন এদেশে অবস্থানকালে তাঁহার অভিজ্ঞতার বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিবরণী হইতে ঐ সময়ের জন-সাধারণের অবস্থা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্ম সম্বন্ধে বহু বিষয় জানা যায়।

ফা-হিয়েন পাটলীপুত্রে তিন বৎসর অবস্থান করিয়া সংস্কৃত ভাষায় অধ্যয়ন করেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, পাটলীপুত্র সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল। পাটলীপুত্রে দুইটি বৌদ্ধমঠ ছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে বহু শিক্ষার্থী বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহ পাঠ করিবার জন্য আগমন করিতেন।

শিক্ষা

পাটলীপুত্রের অধিবাসীদের জীবন ছিল সুখ ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ। ফা-হিয়েন তাহাদের দানশীলতার বিষয়ও উল্লেখ করিয়াছেন।

ফা-হিয়েন মধ্যদেশ (বর্তমান উত্তর প্রদেশ) সম্বন্ধে বহু বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন। ঐ দেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা প্রবল ছিল। অস্পৃশ্যতা বজায় ছিল। চণ্ডালগণ অস্পৃশ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। চণ্ডাল ব্যতীত সকলেই নিরামিষ আহার করিত। ধনী ব্যক্তিগণ জনহিতকর কার্যে এবং ধর্মের বিষয়ে অর্থদান করিতেন।

অস্পৃশ্যতা

হিউয়েন সাঙ

হিউয়েন সাঙের বিবরণঃ হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে হিউয়েন সাঙ নামক জনৈক চৈনিক পরিব্রাজক এদেশে আসিয়াছিলেন। ফা-হিয়েনের ন্যায় বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি ভারতে আসিয়া বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ এবং বৌদ্ধ তীর্থস্থানসমূহ পরিদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি এদেশে আসেন। তিনি মোট চৌদ্দ বৎসর এদেশে অবস্থান করেন, তাহার মধ্যে আট

পরিচিতি

বৎসর হর্ষের রাজ্যে অবস্থান করেন। তাঁহার বিবরণী হইতে ঐ যুগের ভারত সম্বন্ধে বহু মূল্যবান্ তথ্য জানিতে পারা যায়।

হিন্দুসমাজ

তিনি ভারতীয়দের জীবনযাত্রা সহজ, সরল এবং অনাড়ম্বর ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। একমাত্র ধনী ব্যক্তিগণই মূল্যবান্ পোশাক এবং অলংকার পরিধান করিতেন।

হিন্দুসমাজে বর্ণভেদ প্রথার অস্তিত্ব ছিল। ব্রাহ্মণগণ ধর্মকর্মে, ক্ষত্রিয়গণ শাসনকার্যে, বৈশ্যগণ ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং শূদ্রগণ কৃষি ও অন্যান্য কার্যে লিপ্ত থাকিত।

অসবর্ণ বিবাহ নিন্দনীয় ছিল, বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল না। সতীদাহ প্রথার প্রচলন ছিল। উচ্চ-শ্রেণীর মহিলাগণ পর্দা-প্রথাকে স্বীকার করিতেন না।
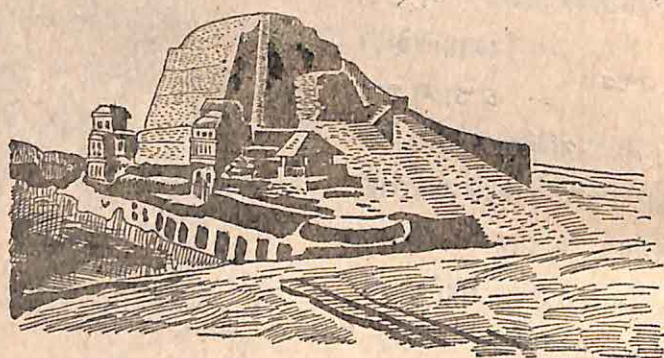
নালন্দার ধ্বংসাবশেষ

ঐ যুগে শিক্ষা-কেন্দ্ররূপে হিউয়েন সাঙ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। হর্ষবর্ধন নালন্দার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি নালন্দার জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতেন। নালন্দার দশ সহস্র শিক্ষার্থী ভারত এবং ভারতের বাহির হইতে আসিয়া ধর্মশাস্ত্র, ব্যাকরণ, ন্যায়, আয়ুর্বেদ, গণিত বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতেন। বাঙালী পণ্ডিত শীলভদ্র নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন। হিউয়েন সাঙ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

হর্ষবর্ধন প্রভৃতি রাজগণের অর্থ সাহায্যে নালন্দার ব্যয় নির্বাহ হইত। প্রায় একশত গ্রামের রাজস্ব নালন্দায় ব্যয় করা হইত।

ঐ সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হ্রাস পাইতে থাকে এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম শক্তিলাভ করিতে শুরু করে। কিন্তু বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পরধর্মসহিষ্ণুতা বজায় ছিল।

অনুশীলনী

১। 'অর্থশাস্ত্রে' যে সামাজিক চিত্র আছে তাহার আলোচনা কর।

২। মেগাস্থিনিসের অনুসরণে তৎকালীন সমাজের শ্রেণী বিভাগের উল্লেখ কর।

৩। ফা-হিয়েনের বিবরণ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৪। হিউয়েন সাঙ হিন্দু সমাজ ও শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার উল্লেখ কর।

মৌখিক প্রশ্ন :

(ক) অর্থশাস্ত্র কি কৌটিল্যের রচিত ?

(খ) মেগাস্থিনিস এদেশে কেন আগমন করেন ?

(গ) ফা-হিয়েন কোন্ সময় এদেশে আগমন করেন ?

(ঘ) হিউয়েন সাঙ নালন্দায় কাহার নিকট শিক্ষালাভ করেন ?

———

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গুপ্তযুগ সুবর্ণময় যুগ

প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে গুপ্তযুগকে সুবর্ণময় যুগ বলা হইয়া থাকে।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর কনিষ্কের আমলে যে রাজনৈতিক ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা পুনরায় বিনষ্ট হয়। গুপ্তরাজগণ ঐ অনৈক্যের অবসান ঘটাইয়া দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা প্রায় দুইশত বৎসর স্থায়ী ছিল। সুশাসনের ফলে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকায় অর্থনৈতিক অবস্থা, শিল্প, স্থাপত্য, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম সকল ক্ষেত্রেই অভাবনীয় উন্নতি ঘটে।

উন্নতির কারণ

সাহিত্য ঃ গুপ্তযুগে সাহিত্যে অভাবনীয় উন্নতি হয়। ঐ যুগে সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিষেণ এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভাকবি বীরসেন বিখ্যাত কবি ছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত স্বয়ং কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। মহাকবি কালিদাস সম্ভবতঃ ঐ যুগে আবির্ভূত হন। কালিদাসের রচনা-সমূহের মধ্যে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্', 'মেঘদূত', 'কুমারসম্ভব' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'মৃচ্ছকটিক' রচয়িতা শূদ্রক এবং 'মুদ্রারাক্ষস' রচয়িতা বিশাখদত্ত ঐ যুগে আবির্ভূত হন। পুরাণ; রামায়ণ ও মহাভারত নূতন রূপ লাভ করিয়াছিল।

অসঙ্গ এবং বসুবন্ধু নামক দুইজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিকেরও গুপ্তযুগে আবির্ভাব ঘটে। অমরসিংহ, অমরকোষ নামক অভিধান প্রণেতা গুপ্তযুগে জন্মগ্রহণ করেন।

বিজ্ঞান ঃ গুপ্তযুগে বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতি ঘটে। জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, রসায়ন ও ধাতুবিদ্যায় উল্লেগযোগ্য উন্নতি হয়। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ বরাহমিহির ঐ যুগে আবির্ভূত হন। আর্যভট্ট এবং ব্রহ্মগুপ্ত গুপ্তযুগে আবির্ভূত

আয়ুর্বেদ

হন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও যথেষ্ট উন্নতি হয়। বিখ্যাত আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকার বাগভট্ট ঐ যুগে বর্তমান ছিলেন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকাররূপে চরকের পরেই বাগভট্টের স্থান।

ঐ যুগে চিকিৎসাশাস্ত্রেরও উন্নতি হইয়াছিল। শল্য চিকিৎসারও সম্ভবতঃ প্রচলন ছিল। প্রসিদ্ধ চিকিৎসাবিদ সুশ্রুত গুপ্তযুগে আবির্ভূত হন বলিয়া অনেক পণ্ডিত অনুমান করিয়া থাকেন।

চিকিৎসাশাস্ত্র

গুপ্তযুগে ধাতুশিল্পেও যথেষ্ট উন্নতি হয়। দিল্লীতে চন্দ্ররাজার নামাঙ্কিত যে লৌহস্তম্ভ রহিয়াছে তাহা গুপ্তযুগের। স্তম্ভটি দেড় সহস্র বৎসরেও অমলিন রহিয়াছে।

ধাতু-বিজ্ঞান

স্তম্ভটি গুপ্তযুগে ধাতুশিল্প যে কত উন্নত ছিল তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

শিল্প ঃ গুপ্তযুগে সংগীত, ভাস্কর্য, স্থাপত্য এবং চিত্রকলা প্রভৃতি শিল্পের বিভিন্ন শাখায় অভাবনীয় উন্নতি হয়।

গুপ্তযুগে সংগীতের যে যথেষ্ট সমাদর ছিল, সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা-গুলিতে তাঁহার বীণা-বাদনরত মূর্তি হইতে তাহা জানা যায়। সমুদ্রগুপ্ত কেবল যোদ্ধা এবং কবি ছিলেন তাহাই নহে, তিনি সংগীতরসিকও ছিলেন। সংগীতের প্রতি তাঁহার অনুরাগ এবং পারদর্শিতা পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়া থাকেন।

সংগীত

গুপ্তযুগে ভাস্কর্য শিল্পের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট বহু বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া ঐ যুগের ভাস্কর্য শিল্প গড়িয়া উঠে।

গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান ঘটে। গুপ্ত-শাসকগণ হিন্দু-ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। গুপ্ত-শাসকগণের পৃষ্ঠপোষকতায়, বহু হিন্দুদের দেব-দেবীর মন্দির এবং মূর্তি নির্মিত হয়। ভারতের যে কয়টি বিখ্যাত শিবমূর্তি রহিয়াছে তাহাদের কয়েকটি গুপ্তযুগেই নির্মিত হয়। কেবল শিবমূর্তিই নহে রাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু প্রভৃতি বহু হিন্দু দেবতাগণের মূর্তিও নির্মিত হয়।

ভাস্কর্য

গুপ্ত-শাসকগণ যদিও হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তবুও গুপ্তযুগে বুদ্ধ এবং বোধিসত্বের বহু প্রস্তরমূর্তিও নির্মিত হয়। ঐ সকল মূর্তিগুলির মধ্যে সারনাথে ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্তি, মথুরায় দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গুপ্তযুগে যে কেবলমাত্র প্রস্তর দ্বারা মূর্তি নির্মিত হইত এমন নহে, ঐ যুগের তাম্র দ্বারা মূর্তি নির্মাণের প্রচলন ছিল। এই প্রসঙ্গে স্থলতানগঞ্জে তাম্রনির্মিত যে বুদ্ধমূর্তিটি পাওয়া গিয়াছে—তাহা শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। পণ্ডিতগণ মূর্তিটিকে গুপ্তযুগে নির্মিত বলিয়া অভিমত পোষণ করিয়া থাকেন।

অজন্তার চিত্রকলা

গুপ্তযুগের ভাস্কর্যের একটি বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। গুপ্তযুগের ভাস্কর্যে মনুষ্যমূর্তি প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। মূর্তিগুলির গঠনকৌশল বিশেষ প্রশংসার দাবি করিতে পারে, মূর্তিগুলি জীবন্ত বলিয়া মনে হয়।

গুপ্তযুগের ভাস্কর্যের সহিত গুপ্তযুগের পূর্ববর্তী যুগের ভাস্কর্য শিল্পের পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। গুপ্তযুগে ভাস্কর্যে মনুষ্য-মূর্তির প্রাধান্য ছিল, কিন্তু গুপ্ত পূর্ববর্তী যুগে জীবজন্তু এবং বৃক্ষলতা প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল।

গুপ্তযুগে শিল্পকেন্দ্ররূপে মথুরা এবং সারনাথ প্রসিদ্ধ ছিল।

স্থাপত্য

গুপ্তযুগে স্থাপত্য-শিল্পেরও উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে। স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শনরূপে গুহা-গৃহ এবং মন্দিরগুলির উল্লেখ করিতে হয়। অজন্তা এবং ইলোরার গুহা-গৃহগুলির নির্মাণ-কৌশল বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। ঐ দুইটি

গুহা-গৃহ ব্যতীত মধ্য-ভারতের বাঘ এবং উদয়গিরির গুহা-গৃহগুলিও ঐ একই কারণে উল্লেখযোগ্য।

পণ্ডিতগণের মতে উদয়গিরি এবং বাদামির (মহারাষ্ট্রে) গুহা-গৃহগুলি বৌদ্ধধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল না, ঐগুলি ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট।

অজন্তার চিত্রকলা

গুপ্তযুগের মন্দির নির্মাণের কৌশলও ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে দেওগড়ের (ঝাঁসী জেলায়) দশাবতার মন্দিরের উল্লেখ করিতে হয়। ঐ মন্দিরটিকে অনেকে গুপ্তযুগের স্থাপত্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। গুপ্তযুগে বহু মন্দির নির্মিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এদেশে মুসলমানগণের আক্রমণের সময়ে ঐ যুগের অধিকাংশ মন্দিরই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

গুপ্তযুগে স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের ন্যায় চিত্রশিল্পেরও উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে। অধিকাংশ চিত্রই বুদ্ধদেবের জীবনী, জাতকের গল্প প্রভৃতি বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া চিত্রিত। অজন্তা, ইলোরা এবং বাঘ গুহার যে সকল চিত্রাবলী অঙ্কিত হয় ঐগুলি গুপ্তযুগের শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন।

চিত্রশিল্প

অনুশীলনী

১। গুপ্তযুগের সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা কর।

২। গুপ্তযুগের শিল্পসম্বন্ধে আলোচনা কর।

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

(ক) কালিদাসের রচনার কয়েকটির নাম উল্লেখ কর। (খ) 'মৃচ্ছকটিক' কে রচনা করেন? (গ) বিশাখদত্ত কোন্ গ্রন্থের রচয়িতা? (ঘ) গুপ্তযুগের ভাস্কর্যে কি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল?

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৃহত্তর ভারতের পরিকল্পনা, ভারত ও প্রতিবেশী রাজ্যসমূহ

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের সহিত বিভিন্ন দেশের যোগাযোগ ছিল। ভারতের সহিত বিভিন্ন দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য বজায় ছিল। বাণিজ্যকে কেন্দ্র করিয়া ঐ সকল দেশগুলির সহিত ভারতের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতি ভারতের বাহিরের বিভিন্ন দেশে প্রসার লাভ করে।

নব্য প্রস্তর যুগ হইতেই ভারতের অধিবাসিগণ এশিয়ার বিভিন্ন অংশের দেশগুলির সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিল।

সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার যুগে মোহেঞ্জোদরো এবং হরপ্পার অধিবাসিগণের সহিত মিশর, সিরিয়া এবং মেশোপটেমিয়া প্রভৃতি দেশের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

প্রাচীনকালে ব্যাবিলনের সহিত যোগাযোগ ছিল কি না সেই বিষয়ে পণ্ডিতগণের মতবিরোধ রহিয়াছে। অনেকে মনে করেন যে ভারতের সহিত ব্যাবিলনের জলপথে যাতায়াতের প্রচলন ছিল। আবার অনেক পণ্ডিত ঐ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু পারস্যের সহিত ভারতের যে প্রাচীন কাল হইতেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মধ্য এশিয়া ঃ মধ্য এশিয়ার সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মধ্য এশিয়ায় খননকার্যের ফলে বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। বহু বৌদ্ধস্তূপ এবং বৌদ্ধমঠের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। বহু হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। ঐ অঞ্চলে ভারতীয় ভাষায় লিখিত বহু পাণ্ডুলিপিও পাওয়া গিয়াছে। মধ্য এশিয়ার খোটানে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল।

মধ্য এশিয়ার ন্যায় পশ্চিম এশিয়ার সহিত ভারতের বিশেষতঃ মৌর্য শাসনকালে ঐ অঞ্চলের গ্রীক রাজগণের সহিত মৌর্য শাসকগণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় ছিল।

পূর্ব এশিয়া ঃ প্রাচীন কাল হইতে এশিয়ার পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব অংশের বহু দেশের সহিত ভারতের যোগাযোগ ছিল। ঐ সকল দেশে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রসার লাভ করিয়াছিল।

অতি প্রাচীন কালেই ব্রহ্মদেশের সহিত ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের পূর্বেই ঐ দেশের উপকূলে এবং অভ্যন্তরে ভারতের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়া থাকেন। ভারতীয় ধর্ম এবং সংস্কৃতি ব্রহ্মদেশের ধর্ম এবং সংস্কৃতির উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করে।

ব্রহ্মদেশ

ব্রহ্মদেশের দক্ষিণে বসবাসকারী তেলং জাতির সহিত অতীতে দক্ষিণ ভারতের তেলেঙ্গানার অধিবাসীদের সম্বন্ধ ছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়া থাকেন। মধ্য ব্রহ্মে প্রাচীন কাল হইতেই বৌদ্ধ এবং বৈষ্ণব ধর্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ব্রহ্মদেশের পূর্বাংশে আরাকানে হিন্দুধর্ম ও উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত ছিল। ব্রহ্মদেশের ভাষার এবং লিপির সহিত ভারতের লিপি এবং পালি ভাষার সাদৃশ্য রহিয়াছে।

প্রাচীনকালে সিয়াম বা শ্যাম দেশে (থাইল্যাণ্ড) ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিরও প্রসার লাভ করে।

সিয়াম ও মালয়

পরবর্তী কালে থাই জাতি সিয়াম অধিকার করিলেও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে। পালি ভাষা ও বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করে।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে মালয়ে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ঐ দেশে ভারতীয় ধর্ম এবং সংস্কৃতি প্রসার লাভ করে। ঐ দেশের নানা স্থানে বহু হিন্দু এবং বৌদ্ধ মন্দির ও মঠের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে যবদ্বীপে (জাভা) হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত হয়। উপনিবেশ স্থাপিত হইবার পর যবদ্বীপে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রসার লাভ করে।

যবদ্বীপ, সুমাত্রা

প্রাচীনকালে যবদ্বীপে বুদ্ধ ও শিব উভয়ের পূজার প্রচলন ছিল। যবদ্বীপের নিজস্ব রামায়ণ রহিয়াছে। ভারতের রামায়ণের সহিত ঐ রামায়ণের যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে।

সুমাত্রায়ও হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে ঐ স্থানটি হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান কেন্দ্রগুলির অন্যতম হিসাবে পরিচিত।

বোর্ণিও, বলি

বোর্ণিও দ্বীপেও খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ঐ দ্বীপে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য বজায় ছিল।

বলি দ্বীপেও হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরবর্তীকালে বলি দ্বীপে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

পুরাকালে বর্তমান কম্বোডিয়ায় এবং কোচিন-চীনে কম্বুজ বা কম্বোজ নামে একটি হিন্দু রাজ্য ছিল। কথিত আছে কৌণ্ডিন্য নামে এক ক্ষত্রিয় একটি হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। অনেকে মনে করেন কম্বোজ রাজ্যের রাজারা ভারতীয় বংশোদ্ভূত ছিলেন।

কম্বোজ

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের পর কম্বোজে একটি নূতন রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বংশের শাসক দ্বিতীয় সূর্যবর্মন জগদ্বিখ্যাত ওঙ্কারভাটের মন্দির নির্মাণ করিয়া অশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। মন্দিরটি শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। মন্দিরটিতে ভারতীয় শিল্প রীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। ঐ বংশের শাসক সপ্তম জয়বর্মন আঙ্কোরথোম শহর নির্মাণ করেন। শহরটির মধ্যস্থলে বিখ্যাত বেয়ন শিবমন্দির অবস্থিত ছিল। ঐ মন্দিরটিতেও ভারতীয় শিল্পের প্রভাব রহিয়াছে। কম্বোজে বৈষ্ণবধর্মের প্রাধান্য ছিল। পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্ম প্রবল হইয়া উঠে।

কম্বোজের পূর্ব সীমান্তে চম্পা নামে একটি হিন্দুরাজ্য ছিল। চম্পা ছিল হিন্দু সংস্কৃতির কেন্দ্র। চম্পায় সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য ছিল। বৌদ্ধধর্মেরও অস্তিত্ব ছিল। শিবের প্রাধান্য বজায় ছিল।

চম্পা রাজ্য

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে সুমাত্রা, জাভা, মালয়, বলি, বোর্ণিও প্রভৃতি লইয়া শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য গঠিত ছিল। শৈলেন্দ্র রাজগণের মূল রাজ্য ছিল মালয় অথবা যবদ্বীপে। শক্তিশালী নৌ-বাহিনীর সাহায্যে তাঁহারা ঐ বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। শৈলেন্দ্র রাজগণ বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখার সমর্থক ছিলেন।

শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য
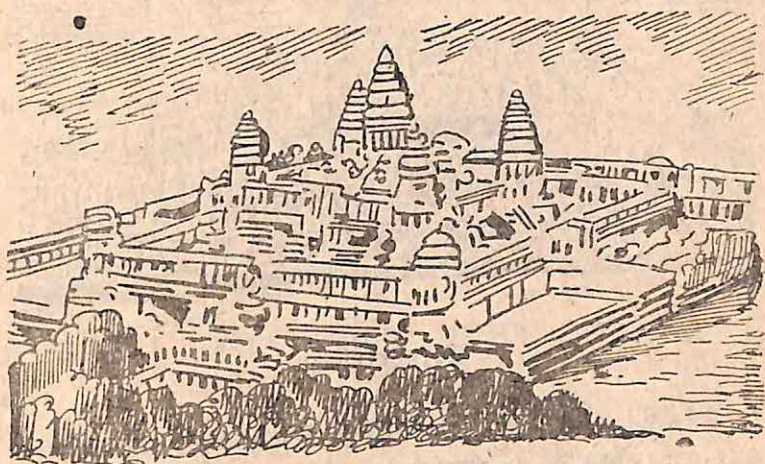
ওঙ্কারভাটের মন্দির

শৈলেন্দ্র রাজগণ ভারতবর্ষ এবং চীন উভয় দেশের সহিত যোগাযোগ বজায় রাখিতেন।

শৈলেন্দ্ররাজ বালপুত্রদেব নালন্দায় মঠ নির্মাণের জন্য বাংলার পালবংশীয় শাসক দেবপালের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। দেবপাল ঐ প্রার্থনা মঞ্জুর করেন এবং ঐ মঠের ব্যয় নির্বাহের জন্য পাঁচখানি গ্রাম দান করেন।

দক্ষিণ ভারতের চোল রাজগণের সহিত শৈলেন্দ্র রাজগণের সংঘর্ষ বাধিয়াছিল। রাজেন্দ্র চোলদেব শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের একাংশ জয় করেন।

শৈলেন্দ্র বংশের শাসনকালে যবদ্বীপের বিখ্যাত বরোবদুরের মন্দিরটি নির্মিত হয়। মন্দিরটিতে ভারতীয় ভাস্কর্যের এবং স্থাপত্যের অনুকরণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

ত্রয়োদশ শতকে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করিয়া চীন এবং ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক
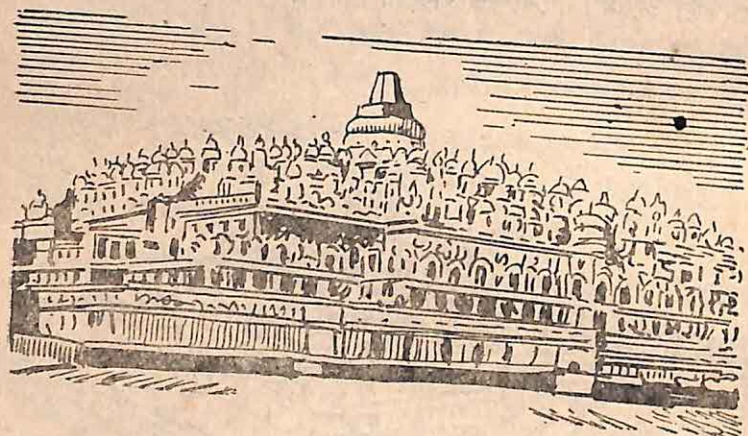
বরোবদুর মন্দির

স্থাপিত হয়। বিভিন্ন সময়ে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা এবং বৌদ্ধধর্মের তীর্থস্থানসমূহ পরিদর্শনের জন্য বহু পরিব্রাজক এদেশে আগমন করেন। এই প্রসঙ্গে ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাঙ, ইৎ-সিং প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

বহু ভারতীয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনূদিত হয়।

চীনের সহিত যোগাযোগ

চীন দেশের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে ভারতীয় শিল্প রীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

ধর্মীয় কারণ ব্যতীত রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক কারণেও ভারতের সহিত চীনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

বৌদ্ধধর্ম চীন দেশ হইতে জাপান এবং কোরিয়াতে প্রসার লাভ করিলে ঐ সকল দেশের ধর্মে ভারতীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়।

সিংহল ঃ ভারতের সহিত সিংহলের সম্পর্কও বহু দিনের। সিংহলের পুরাকালের নাম ছিল লঙ্কা, এবং পরবর্তীকালে সিংহল তাম্রপর্ণী নামে পরিচিত ছিল। কথিত আছে বিজয়সিংহ নামক জনৈক বাঙালী সিংহল জয় করিবার পর দ্বীপটির সিংহল নামকরণ হয়। সিংহলের অধিবাসিগণ প্রধানতঃ দ্রাবিড় এবং আর্যগণের বংশধর বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে।

সিংহল নামকরণ

সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে মৌর্য সম্রাট্ অশোক কন্যা (মতান্তরে ভগ্নী), সংঘমিত্রা এবং পুত্র (মতান্তরে ভ্রাতা) মহেন্দ্রকে সিংহলে প্রেরণ করেন।

অশোক ও সিংহল

দক্ষিণ ভারতের চোল বংশীয় শাসকগণ সিংহলে আধিপত্য বিস্তারের জন্য সচেষ্ট হন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঐ দ্বীপে আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হন।

চোল রাজগণের প্রচেষ্টা

তিব্বত ঃ তিব্বতের সহিতও ভারতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

সপ্তম শতকে তিব্বতের সহিত ভারতের সংস্কৃতির যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করিয়া উভয় দেশের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে বহু ভারতীয় পণ্ডিত, ধর্ম প্রচারক এবং দার্শনিক তিব্বতে গমন করেন। তাঁহাদের মধ্যে শান্তি রক্ষিত, কমলশীল, পদ্মনাভ, অতীশ বা দীপংকর শ্রীজ্ঞানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দীপংকর শ্রীজ্ঞান শেষ জীবন তিব্বতে অতিবাহিত করেন। তিব্বতে তাঁহার দেহাবসান ঘটে।

ভারতীয় পণ্ডিতগণের তিব্বত গমন

বহু তিব্বত-দেশীয় পণ্ডিতও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে ভারতে আগমন করেন। ভারতীয় ভাষায় রচিত বহু গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হয়।

অনুশীলনী

১। প্রাচীনকালে ভারতের সহিত পূর্ব এশিয়ার এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির যে যোগাযোগ ছিল তাহার উল্লেখ কর।

২। প্রাচীনকালে ভারতের সহিত তিব্বত এবং সিংহলের সম্পর্কের বিষয় আলোচনা কর।

মৌখিক প্রশ্ন :

(ক) মধ্য এশিয়ায় খনন কার্যের ফলে কি আবিষ্কৃত হইয়াছে ?

(খ) মধ্য ব্রহ্মে প্রাচীনকাল হইতে কোন্ ধর্মের প্রচলন হয় ?

(গ) সিংহলের অধিবাসিগণ কাহাদের বংশধর বলিয়া অনুমান করা হয় ?

(ঘ) কোন্ বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া ভারত ও তিব্বতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয় ?

তৃতীয় অধ্যায়

বৈদেশিক আক্রমণসমূহের প্রতিরোধ

সূচনা ঃ স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের মধ্য দিয়ে বৈদেশিক আক্রমণকারিগণ ভারত আক্রমণ করিয়া বসতি স্থাপন করিতে থাকে।

ভারতের সুন্দর জলবায়ু এবং অগাধ ঐশ্বর্য বৈদেশিকগণকে ভারত আক্রমণে প্রলুব্ধ করে। বৈদেশিক জাতিসমূহ এদেশে বসবাস করিবার পর কালক্রমে এদেশের জনসমাজের অংশে পরিণত হয়। প্রাচীনকালে ভারত সকলকে স্থান দিয়া আপন করিয়া লয়। কিন্তু পরবর্তীকালে বৈদেশিক আক্রমণকারিগণ বসতি স্থাপনের পরিবর্তে সাম্রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হইলে এদেশীয় শাসকগণ বৈদেশিক আক্রমণকারিগণকে বাধাদানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া বাধা প্রদান করিতে শুরু করেন।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ভারতে পারসিক আক্রমণ সংঘটিত হয়। পারসিক আক্রমণে আক্রমণকারিগণের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ফলে ভারতীয় শাসকগণ পরবর্তীকালে বৈদেশিক আক্রমণকারিগণকে বাধা দান করিতে থাকেন।

পুরু কর্তৃক বাধাদান ঃ বৈদেশিক আক্রমণকারিগণের মধ্যে গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার সর্বপ্রথম এদেশীয় শাসনকর্তা কর্তৃক একক ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হন।

পারসিক আক্রমণের পর গ্রীকগণ ভারত আক্রমণ করে। সর্বপ্রথম যে গ্রীক আক্রমণ ঘটে তাহার নেতা ছিলেন গ্রীসের অন্তর্গত ম্যাসিডন রাজ্যের অধিপতি ভুবনবিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার।

আলেকজাণ্ডার পারস্য অধিকার করিবার পর ৩২৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশ করেন।

আলেকজাণ্ডার

আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন ঐ সময়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে কোন প্রকার রাজনৈতিক

ঐক্যের অস্তিত্ব ছিল না। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। ঐ রাজ্যগুলির কয়েকটি ছিল রাজতন্ত্র শাসিত আবার কয়েকটি ছিল প্রজাতান্ত্রিক রাজ্য। রাজ্যগুলির মধ্যে গান্ধারের পূর্বাংশে তক্ষশীলা রাজ্য এবং ঝিলাম ও চেনাব নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে ছিল পুরু রাজের রাজ্য। ঐ সময়ে রাজা অম্ভি তক্ষশীলার শাসক ছিলেন।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে রাজনৈতিক অনৈক্য

আলেকজাণ্ডার হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশ করেন। তিনি প্রথমে পার্বত্য উপজাতিদিগকে পরাজিত করেন। আলেকজাণ্ডার তক্ষশীলায় গমন করিলে তক্ষশীলার রাজা অম্ভি বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করেন। কেবল অম্ভি নহে, সঞ্জয়, শশীগুপ্ত প্রমুখ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের বিভিন্ন শাসকগণ আলেকজাণ্ডারকে বাধা দান করার পরিবর্তে অন্যান্য রাজ্যগুলি আক্রমণ করিতে নানাভাবে সাহায্য করেন। কিন্তু ঐ সময়ে কয়েকজন শাসক কাপুরুষের ন্যায় আচরণ করিলেও পুরু, অভিসাররাজ এবং মালব, ক্ষুদ্রক রাজ্যের অধিবাসিগণ অসাধারণ বীরত্বের সহিত প্রাণপণ শক্তিতে বৈদেশিক আক্রমণকারীকে বাধা দান করেন। তাঁহাদের দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ অতুলনীয়। এই প্রসঙ্গে পুরুর প্রচেষ্টার পৃথক ভাবে আলোচনার প্রয়োজন।

আলেকজাণ্ডার পুরুর রাজ্য আক্রমণ করিলে পুরু প্রবল বাধা দান করেন। গ্রীক বাহিনী এবং পুরুর সেনাবাহিনী **কারীর** রণক্ষেত্রে পরস্পরের সম্মুখীন হয়। পুরু অসাধারণ বীর এবং সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু সেনানায়ক হিসাবে তিনি আলেকজাণ্ডারের সমকক্ষ ছিলেন না। তিনি গ্রীক বাহিনীকে প্রথম আঘাত হানিবার সুযোগ দান করিয়া মারাত্মক ভুল করেন। যুদ্ধে পুরুর পক্ষে বহু সৈন্য হতাহত হয়। পুরু পরাজিত হন। অসীম বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া পুরু স্বয়ং নয়টি স্থানে আঘাত পাইয়াছিলেন। পুরুকে বন্দী অবস্থায়

পুরু-আলেকজাণ্ডারের মধ্যে যুদ্ধ

আলেকজাণ্ডারের নিকট লইয়া যাওয়া হয়। কথিত আছে, বন্দী পুরুকে আলেকজাণ্ডার তাঁহার নিকট হইতে পুরু কি প্রকার ব্যবহার প্রত্যাশা করেন জিজ্ঞাসা করিলে পুরু রাজার প্রতি রাজার ব্যবহার আশা করেন বলিয়াছিলেন। পুরুর সাহসিকতায় মুগ্ধ হইয়া আলেকজাণ্ডার পুরুর রাজ্য পুরুকে ফিরাইয়া দেন এবং পুরুর রাজ্যের আয়তনও বৃদ্ধি করিয়া দেন।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রচেষ্টা: পুরুর পর গ্রীক আক্রমণ প্রতিহত করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মগধের নন্দ বংশের শাসনের উচ্ছেদ করিয়া মৌর্য বংশের শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন। পণ্ডিতগণের মধ্যে একাংশ মনে করেন যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য শাসনের প্রতিষ্ঠার পূর্বেই পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে বিদেশী গ্রীকগণকে বিতাড়িত করিয়া ঐ অঞ্চলের স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। আবার কোন কোন পণ্ডিতের মতে চন্দ্রগুপ্ত, মৌর্য শাসনের প্রতিষ্ঠার পর গ্রীকগণকে বিতাড়িত করেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কোন্ সময়ে গ্রীকগণকে বিতাড়িত করেন, সেই বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতবিরোধ থাকিলেও চন্দ্রগুপ্তই যে পাঞ্জাব এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন সে বিষয়ে কোন ভিন্নমত নাই।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কর্তৃক গ্রীক বিতাড়ন

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে তাঁহার রাজত্বকালের শেষ ভাগে গ্রীক আক্রমণ প্রতিহত করিতে হয়। আলেকজাণ্ডারের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুর পর তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য তাঁহার সেনাপতিগণের মধ্যে বণ্টন করা হয়। সেলুকস আলেকজাণ্ডারের অন্যতম সেনাপতি, যিনি আলেকজাণ্ডারের সহিত ভারতে আগমন করেন। তিনি আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চল লাভ করেন। সেলুকস সিরিয়ার অধিপতি নামে সুপরিচিত ছিলেন। সেলুকস পাঞ্জাবে এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এক বিশাল সেনাবাহিনীসহ আগমন করেন। তখনও মৌর্য সিংহাসনে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সেলুকস ও চন্দ্রগুপ্ত

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সহিত যুদ্ধের বিবরণ বা ফলাফল সম্বন্ধে গ্রীক লেখকগণের রচনা হইতে কিছুই জানা যায় না। গ্রীক লেখকগণের রচনা হইতে জানা যায় যে সেলুকস ও চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে সন্ধি হয়।

সন্ধি স্থাপন

সেলুকস চন্দ্রগুপ্তকে হিরাট, কান্দাহার, মকরান ও কাবুলের স্বত্ব ত্যাগ করেন। চন্দ্রগুপ্ত এবং সেলুকসের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। চন্দ্রগুপ্তও সেলুকসকে পাঁচ শত হস্তী প্রদান করেন।

গ্রীক লেখকগণের রচনায় সেলুকস পরাজিত হন বলিয়া কোন উল্লেখ না থাকিলেও সন্ধির শর্ত হইতে সেলুকস যে পরাজিত হন সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মৌর্যগণ শক্তিশালী থাকায় গ্রীকগণ পুনরায় ভারত আক্রমণে সাহসী হয় নাই।

মৌর্য বংশের পতন এবং গুপ্ত বংশের উত্থানের মধ্যবর্তীকালে কোন

বৈদেশিক আক্রমণের প্রসার

শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শক্তি না থাকায় ভারতের উত্তর-পশ্চিমে ব্যাকট্রিয়া হইতে আগত গ্রীকগণ, পহ্লব, সবং এবং কুষাণগণ আধিপত্য বিস্তার করে। কুষাণ আধিপত্য ভারতের অভ্যন্তরেও প্রতিষ্ঠিত হয়।

গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর প্রচেষ্টা ঃ শকগণকে পরাজিত করিয়া দক্ষিণ ভারতের **সাতবাহন** বংশীয় শাসক গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনকালে সাতবাহন বংশীয় সিমুক দাক্ষিণাত্যে একটি শক্তিশালী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। সিমুকের পর কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের পর শ্রীসাতকর্ণী রাজা হন। তিনি শক্তিশালী শাসক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার মহিষী নয়নিকা নাবালক পুত্র বেদশ্রী এবং শক্তিশ্রীর অভিভাবিকার কার্য চালাইতে থাকেন। কিন্তু অনতিকাল পরেই শকগণ সাতবাহনের সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ অধিকার করে। কিন্তু শকগণের অধিকার দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে নাই।

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের প্রথম ভাগে সাতবাহন বংশীয় নরপতি গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী শকরাজ নহপানকে পরাজিত করিয়া মহারাষ্ট্র এবং মালব শকদিগের নিকট হইতে অধিকার করেন। তিনি সমগ্র দক্ষিণ ভারতকে বৈদেশিক অধিকার হইতে রক্ষা করেন।

গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর সাফল্য

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের প্রচেষ্টা : গুপ্তবংশীয় শাসক দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শকদিগকে পরাজিত করেন। তিনি 'শকারি' উপাধি ব্যবহার করেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পিতা সমুদ্রগুপ্তের ন্যায় পরাক্রমশালী শাসক এবং কৃতি যোদ্ধা ছিলেন। শকদিগের বিরুদ্ধে সাফল্য তাঁহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কীর্তি। শকদিগকে পরাজিত করিবার জন্য তিনি পূর্ব মালবে ঘাঁটি স্থাপন করিয়া গুজরাট এবং সৌরাষ্ট্রের শক শাসক তৃতীয় রুদ্রসেনের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন।

ঐ সময়ে শ্রীধর বর্মন নামক জনৈক শক কর্মচারী মালবে একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শক রাজ্যের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ এবং বিদ্রোহের সুযোগ গ্রহণ করিয়া শক রাজ্য আক্রমণ করেন। শকরাজ তৃতীয় রুদ্রসেন পরাজিত হইলে পশ্চিম ভারতে শক অধিকারের অবসান ঘটে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শক রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ভূখণ্ড অধিকার করিয়া লইলেন। ফলে আরব সাগর পর্যন্ত গুপ্ত বংশের প্রাধান্য এবং অধিকার প্রসার লাভ করে।

শকরাজ তৃতীয় রুদ্রসেনের পরাজয়

স্কন্দগুপ্তের প্রচেষ্টা : স্কন্দগুপ্ত ছিলেন গুপ্ত বংশের সর্বশেষ শক্তিশালী শাসক। সিংহাসনে আরোহণের অল্পকাল পরেই তাঁহাকে বৈদেশিক আক্রমণের মোকাবিলা করিতে হয়।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শক আধিপত্যের অবসান ঘটান। কিন্তু স্কন্দগুপ্তের সময়ে মধ্য এশিয়া হইতে দুর্ধর্ষ হূনগণ ভারত আক্রমণ করে। হূনগণের আক্রমণের ফলে ভারতের পশ্চিমের এবং উত্তরের স্বাধীনতা বিপন্ন হইয়া পড়ে। স্কন্দগুপ্ত বহু পরিশ্রমে হূন আক্রমণ প্রতিহত করেন। কিন্তু তিনি

হূনগণের পরাজয়

হূনদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করিতে সক্ষম হন নাই। হূনগণ গান্ধার অঞ্চলে স্থায়িভাবে বসবাস করিতে শুরু করে এবং ভবিষ্যতে একাধিকবার হূনগণ আক্রমণ করিয়া এদেশের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করিবার চেষ্টা করে।

যশোধর্মনের প্রচেষ্টা ঃ যশোধর্মন খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের প্রথম ভাগে মালবের অন্তর্গত দশপুর বা মান্দাসোরে রাজত্ব করিতেন। শক্তিশালী শাসক হিসাবে তাঁহার বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। স্কন্দ-গুপ্তের ন্যায় তিনিও হূন আক্রমণ প্রতিহত করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন।

হূনগণ গুপ্ত সম্রাট্ স্কন্দগুপ্ত যতকাল জীবিত ছিলেন ততকাল নূতন করিয়া এদেশের অভ্যন্তরে আগমন করে নাই। স্কন্দগুপ্তের নিকট পরাজিত হইবার পর তাহারা নূতন করিয়া আক্রমণ করিতে সাহসী হয় নাই।

স্কন্দগুপ্তের পর গুপ্ত রাজগণ সকলেই দুর্বল ছিলেন। স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে **তোরমান** নামক নেতার নেতৃত্বে হূনগণ পাঞ্জাব হইতে মালব পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে।

হূন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

তোরমানের পুত্র **মিহিরগুল** পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে বা শাকলে রাজধানী স্থাপন করেন। মিহিরগুল ছিলেন বৌদ্ধবিদ্বেষী। তিনি বহু বৌদ্ধমঠ ধ্বংস করেন। মিহিরগুলের অত্যাচারে দেশবাসী অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। মিহিরগুলের অত্যাচারে অতিষ্ঠ দেশবাসীকে রক্ষা করেন বালাদিত্য এবং যশোধর্মন। যশোধর্মন গুপ্ত বংশীয় শাসক বালাদিত্যের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া যৌথভাবে মিহিরগুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। যুদ্ধে হূনগণ পরাজিত হয়। ভারতবর্ষ সাময়িকভাবে হূন উপদ্রব হইতে রক্ষা পায়।

হূনদের পরাজয়

মিহিরগুলের মৃত্যুর পর হূনগণ সুযোগ্য নেতার অভাবে দুর্বল হইয়া পড়ে। ফলে হূন আক্রমণের তীব্রতা হ্রাস পায়। মৌখরী

রাজগণ এবং থানেশ্বর-রাজ প্রভাকরবর্ধন হূন এবং গুর্জরদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া স্বদেশকে রক্ষা করেন।

যশোধর্মনের কৃতিত্ব

হূন আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষেত্রে যশোধর্মনের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। তিনি যদি বালাদিত্যের সহিত একযোগে হূন আক্রমণ প্রতিহত না করিতেন তাহা হইলে হয়ত হূনগণ দীর্ঘকাল আধিপত্য বজায় রাখিতে সমর্থ হইত এবং দেশবাসী হূনগণের অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ করিত না।

সিন্ধুর দাহির কর্তৃক বৈদেশিক আক্রমণের প্রতিরোধের প্রচেষ্টা :

মুসলমানদের আগমন

প্রচেষ্টা : হূন, গুর্জর প্রভৃতি বৈদেশিক জাতি-সমূহের আক্রমণ স্তব্ধ হইবার পর ভারত মুসলমান আক্রমণের সম্মুখীন হয়।

এদেশে সর্বপ্রথম আরবদেশীয় মুসলমানদের আক্রমণের সম্মুখীন হন সিন্ধুর হিন্দুরাজা দাহির।

সিন্ধু আক্রমণের কারণ

অষ্টম শতকে আরবের মুসলমানগণের শক্তি চরম শীর্ষে আরোহণ করে। অষ্টম শতকের সূচনায় মুসলমানদের ধর্মজগতের অধিকর্তা খলিফা ছিলেন হাজ্জাজ। তিনি আবার ইরাকের শাসনকর্তাও ছিলেন। হাজ্জাজ সিন্ধুর রাজা এবং অধিবাসীদের শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে সিন্ধুর বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন।

সিংহলের নরপতি আটটি ধনরত্নপূর্ণ জাহাজ হাজ্জাজের নিকট উপহার হিসাবে প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে সিন্ধুর দেবল বন্দরে জলদস্যুরা জাহাজগুলি লুণ্ঠন করে। ঐ সময়ে সিন্ধুর হিন্দুরাজা ছিলেন দাহির। হাজ্জাজ দাহিরের নিকট জাহাজগুলি লুণ্ঠনের জন্য প্রতিবাদ জানাইয়া ক্ষতিপূরণ দাবি করেন।

প্রথম আক্রমণ ব্যর্থ

দাহির জলদস্যুদের উপর তাঁহার কোন নিয়ন্ত্রণ নাই এই কথা জানাইয়া ঘটনাটির জন্য তাঁহার দায়িত্ব অস্বীকার করেন। অতঃপর হাজ্জাজ দাহিরের বিরুদ্ধে সৈন্যদল প্রেরণ করেন। দাহিরের বিরুদ্ধে আরবগণের প্রথম

অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আরব বাহিনীর সেনাপতি নিহত হন, দাহির আক্রমণকারী বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন।

প্রথম অভিযানের ব্যর্থতায় আরবগণ বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া আরও উন্নত পরিকল্পনা এবং সুসংহত সেনাবাহিনীসহ মহম্মদ বিন কাশিমের নেতৃত্বে দ্বিতীয় অভিযান প্রেরণ করে।

মহম্মদ বিন কাশেমের অভিযান

মহম্মদ ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে দেবল বন্দরে পৌঁছিয়া বন্দরটি এবং শহরটি অধিকার করেন। বহু ধনরত্ন মহম্মদ হস্তগত করেন। ১৭ বৎসরের ঊর্ধ্বে যাহাদের বয়স ছিল ঐ সকল পুরুষদিগকে হয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে নতুবা মৃত্যুবরণ করিবার সুযোগ দেওয়া হইল। যাহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে তাহাদের সকলকে হত্যা করা হয়।

দেবলের পর মহম্মদ উত্তরদিকে অগ্রসর হন, নিরুনের অধিবাসিগণ বিনা যুদ্ধে নতি স্বীকার করে।

রওয়ারের যুদ্ধ

সিন্ধুর ব্রাহ্মণ রাজা দাহির একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর সমাবেশ করেন। দাহিরের এবং মহম্মদের সেনাবাহিনীর মধ্যে রওয়ারের রণক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার ঘটে। দাহির অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দেন।

দাহিরের পতন

দাহিরের মৃত্যুর পর দাহিরের বিধবা পত্নী এবং পুত্র রওয়ারের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পনের হাজার সৈন্য মুসলমান সেনার আক্রমণ প্রতিহত করিতে থাকে। দুর্গের পতন সুনিশ্চিত জানিয়া দাহিরের পত্নী এবং অন্যান্য মহিলাগণ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দেন। মহম্মদ দুর্গটি অধিকার করেন এবং ছয় হাজার পুরুষকে হত্যা করেন। দুর্গে দাহিরের সঞ্চিত ধন-রত্ন হস্তগত করেন।

মহম্মদের সাফল্য

অতঃপর মহম্মদ দাহিরের রাজধানী ব্রাহ্মণাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হন। ব্রাহ্মণাবাদের অধিবাসিগণ বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করে। মহম্মদ আরোর দুর্গ এবং মুলতানা অধিকার করেন, দাহিরের দুই কন্যাকে বন্দী করিয়া খলিফার নিকট

প্রেরণ করা হয়। তাঁহারা অভিনব উপায়ে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। খলিফা পরে প্রকৃত ঘটনা জানিয়া দাহিরের কন্যাদ্বয়কে নৃশংসভাবে হত্যার আদেশ দান করেন।

জয়পাল ও আনন্দপাল কর্তৃক বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধের প্রচেষ্টা ঃ দাহিরের পর এদেশে মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করেন উদভাণ্ডপুরের শাহীবংশীয় হিন্দুশাসক জয়পাল এবং তাঁহার পুত্র আনন্দপাল।

ভারতে আরবগণের আক্রমণ স্থায়ী হয় নাই। আরব অধিকারও ভারতের একপ্রান্তে সিন্ধুর অনুর্বর অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। সিন্ধু হইতে আরব অধিকার ভারতের অভ্যন্তরে বিস্তারলাভ করে নাই।

তুর্কী আক্রমণ

কিন্তু দশম শতকে ভারত প্রকৃত বিপদের সম্মুখীন হয়। ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কীগণ সীমান্তের নিকটবর্তী কোন স্থানে আধিপত্য বিস্তার করিতে আগ্রহী ছিল না। তুর্কীগণ ভারতের পঞ্চনদ বিধৌত অঞ্চলে উর্বর ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তার এবং লুণ্ঠন করিবার উদ্দেশ্যে বহুবার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া এদেশে সসৈন্যে আগমন করে। তুর্কী শাসকগণের মধ্যে গজনীর সুলতানগণ ভারতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন।

সবুক্তগীন ও জয়পাল

দশম শতকের শেষভাগে গজনীর সুলতান ছিলেন সবুক্তগীন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী। গজনীর সিংহাসন লাভ করিবার পর তিনি হিন্দুস্তান (ভারত) আক্রমণ করিতে মনস্থ করেন। তিনি সিস্তান ও লামঘান আক্রমণ করেন।

সবুক্তগীন ভারতীয় ভূখণ্ড আক্রমণ করিলে তাঁহাকে শাহীবংশীয় জয়পাল বাধাদান করেন। সিস্তান হইতে লামঘান এবং কাশ্মীর হইতে মূলতান পর্যন্ত ভূখণ্ডে জয়পালের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। সবুক্তগীন জয়পালের রাজ্যের অন্তর্গত ভূখণ্ড আক্রমণ করিলে বিরোধের সূত্রপাত হয়। জয়পাল সবুক্তগীনের শক্তি খর্ব করিবার

উদ্দেশ্যে এক বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ গজনী অভিমুখে অগ্রসর হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এক আকস্মিক তুষার ঝটিকায় জয়পালের বাহিনী বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। জয়পাল অন্য কোন উপায় না দেখিয়া সবুক্তগীনের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করেন।

জয়পালের বিপর্যয়

জয়পাল সবুক্তগীনকে দশ লক্ষ দিরাম, পঞ্চাশটি হস্তী এবং কতকগুলি দুর্গের অধিকার ত্যাগ করার প্রতিশ্রুতি দান করেন। কিন্তু স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিবার পর জয়পালের মতের পরিবর্তন ঘটে। তিনি ঐ অপমানজনক সন্ধিকে অস্বীকার করেন এবং সবুক্তগীনের দুইজন কর্মচারীকে বন্দী করেন। অতঃপর সবুক্তগীন জয়পালের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন।

জয়পালের মতের পরিবর্তন

সবুক্তগীনের বিরুদ্ধে জয়পালকে আজমীর, দিল্লী, কানপুর এবং কনৌজের শাসকগণ অকুণ্ঠ সাহায্যদান করেন। জয়পাল এক লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী লইয়া সবুক্তগীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু ঐ বিশাল সেনাবাহিনী থাকা সত্ত্বেও জয়পাল পরাজিত হন। সবুক্তগীন বহু অর্থ আদায় করেন। লামঘান এবং পেশোয়ারের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে গজনীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সবুক্তগীন ঐ অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটাইলেন।

জয়পালের পরাজয়

ভারতের ঐশ্বর্যের এবং উর্বরতার বিষয় গজনীতে প্রচারিত হইতে থাকে। ভারতের ঐশ্বর্য এবং উর্বর ভূখণ্ড সবুক্তগীনের পুত্র মামুদকে এবং পরবর্তী কালের মুসলমানদের ভারত আক্রমণে প্রলুব্ধ করে।

৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সবুক্তগীনের মৃত্যু হয়। সবুক্তগীন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মামুদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত না করিয়া অপর এক পুত্র ইসমাইলকে গজনীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারীরূপে মনোনয়ন করেন। কিন্তু সবুক্তগীনের মৃত্যুর পর মামুদ বলপূর্বক গজনীর সিংহাসন দখল করেন। শীঘ্রই তিনি খলিফার স্বীকৃতিলাভ করেন। খলিফা তাঁহাকে শাসক হিসাবে স্বীকৃতিদানের পর মামুদ দিগ্বিজয়ে বাহির হন।

সুলতান মামুদ

মামুদের প্রধান লক্ষ্য ছিল ভারত। তিনি পিতার নীতির অনুসরণ করেন।

মামুদ সতের বার ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য আক্রমণ করেন, তাহাদের মধ্যে একাধিকবার তিনি জয়পাল এবং তাঁহার বংশধরগণের বিরুদ্ধে লিপ্ত থাকেন।

মামুদ ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে সীমান্তের কয়েকটি স্থান আক্রমণ করেন এবং অধিকার করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে তাঁহার বিশ্বাস-ভাজন ব্যক্তির হস্তে স্থানগুলির দায়িত্ব অর্পণ করেন।

মামুদের নিকট জয়-পালের পরাজয়

১০০১ খ্রীষ্টাব্দে মামুদের সহিত সর্বপ্রথম উদভাণ্ডপুরের শাহী বংশীয় শাসক জয়পালের সংঘর্ষ বাধে। মামুদ দশ সহস্র বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন অশ্বারোহীসহ পেশোয়ারের নিকট উপস্থিত হন। তখনও মামুদের পিতার প্রতিদ্বন্দ্বী জয়পাল শাহী বংশের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পেশোয়ারের নিকটে মামুদের সহিত জয়পালের প্রবল যুদ্ধ হয়। প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও জয়পাল পরাজিত ও বন্দী হন। তাঁহার পুত্র এবং পৌত্রও বন্দী হন। মামুদ প্রচুর ধনরত্ন লাভ করেন। জয়পাল প্রচুর ধনরত্ন দানের প্রতিশ্রুতি দান করিয়া সন্ধি করেন। তাঁহার এক পৌত্রকে জামিন স্বরূপ বন্দী করা হয়।

জয়পালের আত্মহত্যা

কথিত আছে মামুদ বন্দী জয়পালের কণ্ঠের বহুমূল্য হারও ছিনাইয়া লন। জয়পাল স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া যুদ্ধে পরাজয়ের অপমানের জ্বালা ভুলিবার জন্য জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন করেন।

জয়পালের মধ্যে সাহস এবং আন্তরিকতার অভাব ছিল না। তিনিই সর্বপ্রথম তুর্কী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। একাধিকবার পরাজিত হইয়াও তিনি তুর্কী সেনাবাহিনীর অগ্রগতি রোধ করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

জয়পালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আনন্দপাল শাহী বংশের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১০০৮ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মামুদের

সহিত আনন্দপালের সংঘর্ষ বাধে। মামুদের বিরুদ্ধে আনন্দপালকে গোয়ালিয়র, উজ্জয়িনী, কালঞ্জার, কনৌজ, দিল্লী এবং আজমীরের শাসকগণ বিশেষভাবে সাহায্যদান করেন। অনেকে সৈন্য-সাহায্যও করেন। কথিত আছে বহু দূর প্রান্তের হিন্দু মহিলাগণও আনন্দপালকে সাহায্যদানের জন্য তাঁহাদের অলংকারাদি প্রেরণ করেন। সীমান্তের উপজাতিরাও যোগদান করে।

মামুদ ও আনন্দপাল

সীমান্তের 'খোখর' নামক উপজাতি-যোদ্ধাগণ মামুদের বহু সৈন্যকে হত্যা করিলে মামুদ বিপন্নবোধ করিয়া যুদ্ধ বন্ধ করিবার বিষয় ভাবিতেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যে হস্তীটির পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আনন্দপাল যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছিলেন অকস্মাৎ হস্তীটি ভীত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে। হিন্দু বাহিনী নেতার অভাবে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া মামুদের সেনাবাহিনী বহু হিন্দুকে হত্যা করে।

আনন্দপালের দুর্ভাগ্য

পরাজিত হইলেও আনন্দপালের মনোবল অটুট থাকে। তিনি মুসলমান আক্রমণকারীকে বাধাদানের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। নন্দনা নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া তিনি শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকেন।

আনন্দপালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ত্রিলোচনপাল এবং পৌত্র ভীমপালও মামুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন।

জয়পাল এবং আনন্দপাল আন্তরিকভাবে বৈদেশিক আক্রমণ-কারিগণকে বাধাদান করেন। কিন্তু তাঁহারা মামুদের ন্যায় দক্ষ সেনানায়ক ছিলেন না। ইহা ব্যতীত ইসলাম ধর্মের প্রভাবে নূতন শক্তিতে বলীয়ান হইয়া তুর্কীগণ আক্রমণ করে। হিন্দুদের মধ্যে সেই প্রকার প্রেরণার অভাব ছিল।

সংগ্রাম অব্যাহত

পৃথ্বীরাজ চৌহানের প্রচেষ্টা : সুলতান মামুদের মৃত্যুর পর গজনীর দুর্বলতার সূত্রপাত ঘটে। ক্রমে গজনীর সামন্তরাজ্য **ঘোর** শক্তিশালী হইয়া উঠে।

দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ঘোররাজ্যের অধিপতির ভ্রাতা

মহম্মদ ঘোরী ভারত আক্রমণ করেন। মহম্মদ ঘোরী ভারতবর্ষের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিবার জন্যই এদেশ আক্রমণ করেন নাই, এদেশে আধিপত্য বিস্তার ছিল তাঁহার প্রধান লক্ষ্য।

মহম্মদ ঘোরী

মহম্মদ ঘোরী যখন এদেশ আক্রমণ করেন তখন উত্তর ভারতের কোন রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। কোন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শক্তিরও অস্তিত্ব ছিল না। কাশী এবং কনৌজের রাজা জয়চন্দ্র এবং দিল্লী ও আজমীরের রাজা ছিলেন পৃথ্বীরাজ চৌহান। তাঁহারা উভয়ে শক্তিশালী ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। তাঁহারা যৌথভাবে মহম্মদ ঘোরীকে বাধাদান করেন নাই। যদি তাঁহারা সম্মিলিতভাবে বাধাদান করিতেন তাহা হইলে ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনায় দিল্লীর সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠিত হইত কিনা সন্দেহ।

উত্তর ভারতের অনৈক্য

পৃথ্বীরাজ

মহম্মদ ঘোরী সুলতান মামুদের ন্যায় বহুবার এদেশ আক্রমণ করেন। তিনি সর্বপ্রথম পৃথ্বীরাজ চৌহানের বাধার সম্মুখীন হন। ১১৯০-৯১ খ্রীষ্টাব্দে পৃথ্বীরাজ থানেশ্বরের নিকট তরাইনের প্রান্তরে মহম্মদ ঘোরীকে পরাজিত করিয়াছিলেন। মহম্মদ ঘোরী স্বয়ং আহত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

তরাইনের প্রথম যুদ্ধ

কিন্তু পৃথ্বীরাজের নিকট পরাজিত হইলেও মহম্মদ ঘোরী নিরুৎসাহিত না হইয়া ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় নূতন শক্তি সঞ্চয়

করিয়া আগমন করেন। মহম্মদের সেনাবাহিনীর নিকট পৃথ্বীরাজের বাহিনী বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। পৃথ্বীরাজ স্বয়ং বন্দী হন। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ পরাজিত হইলেন। দিল্লী ও আজমীরের পতন হয়। কেবল তাহাই নহে, সমগ্র উত্তর-ভারতে মুসলমানদের আধিপত্যের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হইয়া পড়ে।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজের পরাজয়

অনুশীলনী

১। গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে পুরুর প্রতিরোধের উল্লেখ কর।

২। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কর্তৃক বৈদেশিক আক্রমণের প্রতিরোধের বিষয় আলোচনা কর।

৩। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এবং স্কন্ধগুপ্ত কর্তৃক বৈদেশিক আক্রমণের প্রতিরোধের বিষয় উল্লেখ কর।

৪। সিন্ধুর দাহিরের মুসলমান আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উল্লেখ কর।

৫। জয়পাল ও আনন্দপালের সহিত গজনীর শাসকগণের বিরোধের ইতিহাস লিখ।

৬। পৃথ্বীরাজ চৌহানের সহিত মহম্মদ ঘোরীর সংঘর্ষের বিবরণ দাও।

৭। টীকা লিখ :—(ক) গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী এবং বিদেশী শাসকগণের মধ্যে সংঘর্ষ। (খ) যশোধর্মন এবং হূন আক্রমণ।

মৌখিক প্রশ্ন :

(ক) সেলুকসের সহিত সন্ধির দ্বারা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কোন্ কোন্ স্থান লাভ করেন?

(খ) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের নিকট পরাজিত শক শাসকের নাম কি?

(গ) যশোধর্মনের সমসাময়িক হূন নেতা কে ছিলেন?

(ঘ) মহম্মদ বিন কাশিম কে ছিলেন?

(ঙ) জয়পাল কোন্ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন?

(চ) পৃথ্বীরাজ কোন্ যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরীর নিকট পরাজিত হন?

———

চতুর্থ অধ্যায়

পাল ও সেন যুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাস

সামাজিক জীবনঃ বাংলা বহুদিন আর্য সভ্যতার প্রভাবমুক্ত ছিল। আর্যগণ যখন সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে তখন এবং তাহার পরবর্তী কালেও বাংলায় আর্য সভ্যতা বিস্তার লাভ করে নাই। বহু প্রাচীন কাল হইতেই বর্তমান দিনের আদিবাসিগণের পূর্বপুরুষগণ (অনার্য) বাংলাদেশে বসবাস করিতেন। বৈদিক সভ্যতার শেষভাগে বাংলার আর্য অধিকার বিস্তারলাভ করে এবং আর্য প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়।

আর্য প্রভাব

বহু জাতির সংমিশ্রণে বাঙালী জাতির উৎপত্তি হয়। বাংলাদেশে আর্যজাতির আগমন এবং আর্য প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হয়। প্রাচীন-কালে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এবং শূদ্র—এই চারিবর্ণের অস্তিত্ব ছিল। ঐ চারিবর্ণের জনগণের নিজ নিজ বৃত্তিও নির্দিষ্ট ছিল।

বর্ণাশ্রম

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম এবং জৈনধর্ম প্রসারলাভ করায় বর্ণাশ্রম প্রথা শিথিল হইয়া পড়ে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান ঘটে, গুপ্ত রাজগণ সকলেই হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনরুজ্জীবিত হওয়ায় বর্ণাশ্রম প্রথারও পুনঃ প্রবর্তন ঘটে। ঐ সময়ে সমাজ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

পালরাজগণ ছিলেন বৌদ্ধ। পালযুগে ভারতের বিভিন্ন অংশে বৌদ্ধধর্ম দুর্বল হইয়া পড়ে, কিন্তু পালরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ও বিহারে বৌদ্ধধর্ম প্রবল আকার ধারণ করে। পালরাজগণ বৌদ্ধ-ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হইলেও পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন। পালরাজগণের মধ্যে কয়েকজন বর্ণাশ্রম প্রথার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে আগ্রহী ছিলেন। 'বল্লাল চরিত' গ্রন্থে উল্লেখ

পালযুগ

আছে যে কোন জাতিকে উন্নত বা অবনত করিবার ক্ষমতা রাজার ছিল। কিন্তু পালযুগের লিপি হইতে জানা যায় যে তাঁহারা সাধ্যপক্ষে বর্ণাশ্রম অব্যাহত রাখিতে আগ্রহী ছিলেন।

সেনরাজগণ হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সেনযুগে উল্লেখ-যোগ্য সমাজসংস্কার প্রবর্তিত হয়। সেনরাজ বল্লাল সেন তান্ত্রিক হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ঐ ধর্ম, প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে বল্লাল সেন চট্টগ্রাম, আরাকান এবং নেপালে ধর্মপ্রচার করেন।

সেনযুগে সমাজসংস্কার

সেন যুগের পূর্বে বৌদ্ধধর্ম প্রবল থাকায় বর্ণাশ্রম প্রথার শৈথিল্য দেখা দেয়। সেনরাজ বল্লাল সেন বর্ণাশ্রম প্রথা কঠোরভাবে প্রবর্তন করিতে আগ্রহী ছিলেন। সমাজে সংস্কার প্রবর্তন করিয়া সমাজকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে বল্লাল সেন হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণের মধ্যে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেন। ন্যায়পরায়ণতা, পবিত্রতা ও সততা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করা হয়। বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক

কৌলীন্য প্রথা

অনুষ্ঠানে কুলীনদিগকে বিশেষ রীতিনীতি অনুসরণ করিতে হইত। কিন্তু পরবর্তী কালে কুলীন এবং যাঁহারা কুলীন ছিলেন না—হিন্দু সমাজের এই দুই অংশের মধ্যে অসদ্ভাব পরিলক্ষিত হয়, ফলে সমাজের ভিত্তি দৃঢ় হইবার পরিবর্তে দুর্বল হইয়া পড়ে। ইহা ব্যতীত কৌলীন্য প্রথার অপব্যবহারের ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে নানাপ্রকার কুফল পরিলক্ষিত হয়।

সেন যুগে স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি সংস্কারসমূহ ব্যাপক-ভাবে পরিলক্ষিত হয়।

সংস্কৃতির ইতিহাস : সংস্কৃতি ও সভ্যতার উন্নতির জন্য পাল যুগ ও সেন যুগ বিশেষরূপে চিহ্নিত। শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম ও শিক্ষার উন্নতির জন্য পাল ও সেন যুগ বাংলার ইতিহাসে বিশেষ গৌরবময়।

পাল যুগ : পাল যুগে সংস্কৃত ভাষায় রচিত কাব্য ও সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হয়। বৈদিক সাহিত্য, ব্যাকরণ ও বেদান্তের যথেষ্ট চর্চা ছিল।

পাল যুগে অভিনন্দের আবির্ভাব ঘটে। তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে একটিও আবিষ্কৃত হয় নাই। তাঁহার রচিত কয়েকটি শ্লোক অন্যান্য সাহিত্যসেবিগণ কর্তৃক উদ্ধৃত হয়। ঐ যুগে বিখ্যাত ন্যায়শাস্ত্র বিশারদ শ্রীধরভট্ট 'ন্যায়-কন্দলী' গ্রন্থের প্রণয়ন করেন। বিখ্যাত আইন রচয়িতা জীমূতবাহন পাল যুগে আবির্ভূত হন। উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে তাঁহার দায়ভাগ আইন বাংলায় বিশেষরূপে প্রযোজ্য ছিল। ভারতের অন্যান্য প্রান্তে দায়ভাগের পরিবর্তে মিতাক্ষরা আইনের প্রচলন ছিল।

সাহিত্য

পাল যুগে সংস্কৃত ভাষায় রচিত একটি মাত্র কাব্যগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থটির নাম 'রামচরিত' রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দী। সন্ধ্যাকর নন্দী বরেন্দ্রের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম প্রজাপতি নন্দী। প্রজাপতি নন্দী রামপালের আমলে পদস্থ কর্মচারী ছিলেন।

সন্ধ্যাকর নন্দী পালরাজ মদনপালের আমলে রামচরিত কাব্য রচনা করেন। কাব্যটিতে কৈবর্ত্য বিদ্রোহ, রামাবতী নগরের বর্ণনা এবং রামপালের সাফল্যের বিবরণ রহিয়াছে। কবি এই কাব্য গ্রন্থটিতে সুকৌশলে এমন শব্দ ও বর্ণের ব্যবহার করিয়াছেন যাহাতে একই সঙ্গে রামচন্দ্র ও রামপালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে। কাব্যগ্রন্থ হিসাবে রামচরিতের কোন উল্লেখ বৈশিষ্ট্যের দাবি করিতে পারে না। কিন্তু রামচরিতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে মূল্য অসাধারণ।

'রামচরিত'

পালযুগে বৈদ্যক শাস্ত্রে কয়েকজন বাঙালী লেখক বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকাররূপে চক্রপাণি দত্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি চরকের এবং সুশ্রুতের উপর টীকা রচনা করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার রচিত 'আয়ুর্বেদ দীপিকা' গ্রন্থটি চরকের রচনার উপর এবং 'ভানুমতী' সুশ্রুতের রচনার উপর টীকা। চক্রপাণি দত্ত 'শব্দ-চন্দ্রিকা' এবং 'দ্রব্যগুণ সংগ্রহ' নামক অপর

বৈদ্যক শাস্ত্রকার চক্রপাণি দত্ত

দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার রচিত 'চিকিৎসা-সংগ্রহ' গ্রন্থ হইতে তাঁহার পরিচয় জানা যায়।

পাল যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বীজ বপন করা হয়। পাল যুগে বহু 'চর্যাপদ' রচিত হয়। চর্যাপদগুলি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালে আবিষ্কার করেন। মোট ৪৭টি চর্যাপদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐগুলি ২৩ জন কবির রচিত। কাহ্নপা বা কাহ্নপাদ ১২টি চর্যাপদ রচনা করেন।

চর্যাপদ

চর্যাপদগুলিতে সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের গূঢ় আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা রহিয়াছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে চর্যাপদগুলির গুরুত্ব অসাধারণ। চর্যাপদগুলি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎসরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। চর্যাপদগুলি হইতে বৈষ্ণব সাহিত্য, বাউলগান প্রভৃতি জন্মলাভ করে।

বৌদ্ধধর্ম ও শিক্ষার প্রসার

পালরাজগণ ছিলেন বৌদ্ধধর্মে অনুরক্ত। পালযুগে ভারতের অন্যান্য স্থানে বৌদ্ধধর্ম দুর্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু পালরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা এবং বিহারে বৌদ্ধধর্ম প্রবল হইয়া উঠে। পালরাজগণ বহু বিহারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল (বর্তমান বিহার শরীফের নিকট) ওদন্তপুর বিহারের প্রতিষ্ঠা করেন।

বিক্রমশীলা

পালরাজ ধর্মপাল বিখ্যাত বিক্রমশীলা মহাবিহারের প্রতিষ্ঠা করেন। বিক্রমশীলা মহাবিহার বিহারের বর্তমান ভাগলপুর জেলায় অবস্থিত ছিল। পাল যুগে বিক্রমশীলা, ওদন্তপুর ব্যতীত সোমপুর (পাহাড়পুর), ত্রৈকুটক প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ বিহার ছিল। কিন্তু সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিল ধর্মপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিক্রমশীলা মহাবিহার। বিক্রমশীলা ছিল একটি অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্র। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে এমন কি ভারতের বাহির হইতেও বহু শিক্ষার্থী শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে বিক্রমশীলায় আগমন করিতেন। বিক্রমশীলার আচার্য ছিলেন বুদ্ধ

জ্ঞানপাদ। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানও বিক্রমশীলায় অধ্যাপনা করিতেন। সর্বসমেত ১১৪ জন অধ্যাপক অধ্যাপনা করিতেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় পালযুগেও বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল। পালরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা পূর্ব গৌরবের আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে এমন কি ভারতের বাহির হইতেও বহু শিক্ষার্থীর সমাগম হইত।

দেবপালের রাজত্বকালে সুবর্ণভূমির শাসক বালপুত্রদেব দেবপালের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া নালন্দায় মঠ নির্মাণের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। দেবপাল ঐ প্রার্থনা মঞ্জুর করেন এবং মঠের ব্যয় নির্বাহের জন্য পাঁচখানি গ্রাম দান করেন। দেবপাল স্বয়ং কয়েকটি মঠের প্রতিষ্ঠা করেন।

নালন্দা

পাল যুগে কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিত আবির্ভূত হন। পাণ্ডিত্যের জন্য সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিলেন অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তাঁহার বাল্যের নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। তিনি বিখ্যাত পণ্ডিত জেতারির নিকট শিক্ষা লাভ করেন। মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে ওদন্তপুর বিহারের বৌদ্ধ আচার্য শীল রক্ষিতের নিকট দীক্ষা লাভ করেন এবং দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নামে পরিচিত হন। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে সুবর্ণভূমি গমন করেন এবং ঐ দেশে বার বৎসর অবস্থান করেন। সিংহল হইতে মগধে আগমন করিয়া বিক্রমশীলা মহাবিহারের আচার্যপদ লাভ করেন।

অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

তিব্বতরাজের অনুরোধে তিনি তিব্বত গমন করিয়া ঐ দেশে বিশুদ্ধ মহাযান ধর্ম প্রচার করেন এবং প্রচলিত বৌদ্ধধর্মে সংস্কার

প্রবর্তন করেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রায় দুই শতাধিক বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন।

পাল যুগে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ব্যতীত শান্তিরক্ষিত এবং রাহুলভদ্র প্রমুখ পণ্ডিতগণের আবির্ভাব ঘটে।

পালরাজগণ শিল্প ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পাল যুগে নির্মিত ওদন্তপুর বিহার এবং সোমপুর বিহার পাল যুগের শিল্প-স্থাপত্যের উন্নতির নিদর্শন।
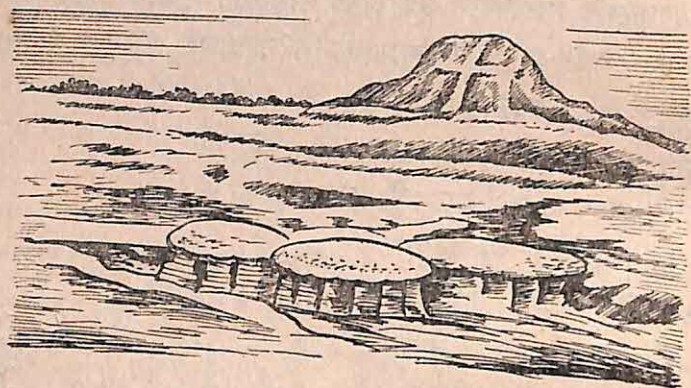
সোমপুরের (পাহাড়পুর) ধ্বংসাবশেষ

রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে সোমপুর বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ বিহারটি ছিল আয়তনে সর্ববৃহৎ। ওদন্তপুর ও সোমপুর বিহার শিল্প-স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যের জন্য তিব্বত ও সুমাত্রায় প্রসিদ্ধি অর্জন করে। ঐ দুইটি দেশে ঐ বিহারগুলির স্থাপত্যের অনুকরণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

শিল্প

পাল যুগে চিত্রশিল্পও উন্নত ছিল। পাল যুগে বীটপাল ও ধীমান প্রসিদ্ধ শিল্পী ছিলেন। সুমাত্রা ও যবদ্বীপের শিল্পধারার উপর তাঁহাদের যথেষ্ট প্রভাব পড়িয়াছিল।

সেন যুগঃ পাল যুগের ন্যায় সেন যুগও বাংলার ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায়। সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নতির জন্য সেন যুগ

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেন রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে। ঐ যুগে এদেশে বহু কবি ও সাহিত্যসেবীর আবির্ভাব ঘটে।

সাহিত্য ঃ সেনরাজ বল্লাল সেন স্বয়ং নাকি পাঁচখানি গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু তাহাদের মধ্যে 'দান সাগর' এবং 'অদ্ভুত সাগর' নামক দুইখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। সেনরাজ বল্লাল সেনের গুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট 'হারলতা' ও 'পিতৃদয়িতা' নামক দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থ দুইটি হইতে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান এবং নিত্যকর্ম-পদ্ধতির বিষয় জানা যায়।

বল্লাল সেন, অনিরুদ্ধ ভট্ট

সেন যুগের অপর প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ছিলেন হলায়ুধ। লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে তিনি বিভিন্ন উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হলায়ুধ 'ব্রাহ্মণ সর্বস্ব', 'মীমাংসা সর্বস্ব' প্রভৃতি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। হলায়ুধের রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে একমাত্র 'ব্রাহ্মণ সর্বস্ব' গ্রন্থখানির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। হলায়ুধ বাংলার ব্রাহ্মণদিগকে বেদের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে সাহায্যদানের জন্য এবং বৈদিক ক্রিয়াকর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য গ্রন্থ রচনা করেন।

হলায়ুধ

গ্রন্থকার হিসাবে হলায়ুধ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। বাংলা এবং বাংলার বাহিরে হলায়ুধের গ্রন্থ বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল।

সেন যুগে ঈশান ও পশুপতি হিন্দুধর্মের ক্রিয়া কলাপের উপর দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

সেন যুগে ভাষাতত্ত্ববিদ্ হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন সর্বানন্দ। সর্বানন্দ প্রসিদ্ধ 'অমরকোষ' গ্রন্থের উপর 'টীকা সর্বস্ব' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দান করেন। ভারতের সর্বত্র সর্বানন্দের 'টীকা সর্বস্ব' গ্রন্থটি বিপুল সমাদর লাভ করে।

সর্বানন্দ

সেন যুগে শ্রীধর দাস 'সদুক্তিকর্ণামৃত' নামক গ্রন্থে সংস্কৃত কবিতার সংকলন করেন। গ্রন্থটির কবিতার সংখ্যা ২৩৭০টি এবং কবির সংখ্যা ৪৮৫ জন। গ্রন্থটিতে সেনরাজ বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেনের রচিত কবিতাও স্থান লাভ করিয়াছিল।

'সদুক্তিকর্ণামৃত'

ধোয়ী, উমাপতিধর, গোবর্ধন, শরণ এবং জয়দেব লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা অলংকৃত করিতেন। ধোয়ী প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তিনি মহাকবি কালিদাসের অমর কাব্য 'মেঘদূতে'র অনুকরণে 'পবন দূত' কাব্য রচনা করেন। কাব্যটির মোট শ্লোকের সংখ্যা ১০৪টি। মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূতে'র অনুকরণে পরবর্তী কালে যে সকল দূত কাব্য রচিত হয় তাহাদের মধ্যে কবি ধোয়ীর 'পবন দূত' সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন।

ধোয়ী

উমাপতি ধর বাক্য রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। কবি হিসাবেও তাঁহার প্রসিদ্ধি ছিল।

শ্রীধর দাস কর্তৃক সংকলিত 'সদুক্তিকর্ণামৃত' নামক কাব্য সংকলনে উমাপতি ধরের ৯০টি কবিতা স্থান লাভ করে। তিনি সম্ভবতঃ উমাপতি নামে 'চন্দ্রচূড় চরিত' কাব্য রচনা করেন।

গোবর্ধনও কাব্য-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি আচার্য গোবর্ধন নামে পরিচিত ছিলেন।

কবি শরণও প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' গ্রন্থে তাঁহার কবিতা স্থান লাভ করে।

লক্ষ্মণ সেনের আমলের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন জয়দেব। তিনি 'গীত গোবিন্দম্' রচনা করিয়া কবি হিসাবে অমরত্বের অধিকারী হন। 'গীত গোবিন্দম্' ভারতের সর্বত্র বিপুল সমাদর লাভ করে। আজিও গ্রন্থটির সমাদর রহিয়াছে।

জয়দেব

জয়দেবের ন্যায় বহু বৈষ্ণব কবি সেন যুগে আবির্ভূত হন। ফলে বহু বৈষ্ণব কাব্য রচিত হয়। সেনরাজগণ ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, ফলে হিন্দুধর্মকে আশ্রয় করিয়া বহু গ্রন্থ রচিত হয় এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ঘটে।

বল্লাল সেন তান্ত্রিক হিন্দুধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে নেপাল, আরাকান, উড়িষ্যা ও চট্টগ্রামে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেন।

শিল্প ঃ সেন যুগে শিল্পেরও উন্নতি ঘটে। বিষ্ণু, শিব, পার্বতী প্রভৃতি বহু হিন্দু দেব-দেবীর মন্দির নির্মিত হয়।

সেন যুগে এক শিল্পী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল। ঐ যুগে বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন শূলপাণি।

অনুশীলনী

১। পাল ও সেন যুগের সামাজিক চিত্র বর্ণনা কর।

২। পাল যুগের সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৩। সেন যুগের সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৪। টীকা লিখ ঃ—(ক) চক্রপাণি দত্ত, (খ) চর্যাপদ, (গ) বিক্রমশীলা মহাবিহার, (ঘ) নালন্দা, (ঙ) অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, (চ) কৌলীন্য প্রথা, (ছ) হলায়ুধ, (জ) জয়দেব।

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

(ক) চর্যাপদ কি? কে কোথায় চর্যাপদের আবিষ্কার করেন?

(খ) কৌলীন্যপ্রথা কে প্রবর্তন করেন?

(গ) জীমূতবাহন কে ছিলেন?

(ঘ) সোমপুর বিহার কোথায় অবস্থিত ছিল?

(ঙ) পাল যুগের দুইজন শিল্পীর নাম উল্লেখ কর।

(চ) সর্বানন্দের বিখ্যাত গ্রন্থের নাম কি?

(ছ) 'সদুক্তিকর্ণামৃত' কি? সংকলনকারী কে ছিলেন?

(জ) 'পবনদূত' কি? রচনাকারীর নাম কি?

(ঝ) লক্ষ্মণ সেনের আমলের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কে ছিলেন?

———

পঞ্চম অধ্যায়

দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস

প্রাচীন ইতিহাস: বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণের ভূখণ্ডকে দক্ষিণাপথ এবং কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণের ভূখণ্ডকে সুদূর দক্ষিণ বলা হইয়া থাকে। অতি প্রাচীন ভূখণ্ড হইলেও দক্ষিণ ভারতে রামায়ণের যুগের পূর্বে আর্যসভ্যতা বিস্তার লাভ করে নাই। আর্যসভ্যতার বিস্তারের পর আর্য এবং আদি অধিবাসী দ্রাবিড়গণের সভ্যতার সমন্বয়ে এত উন্নত সভ্যতার বিকাশ ঘটে।

মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারতের বৃহৎ অংশে আধিপত্য বিস্তার করেন। অশোকের সময়ে ঐ অঞ্চলের কয়েকটি রাজ্যকে প্রত্যন্ত রাজ্য রূপে বর্ণনা করা হইত।

মৌর্য-পরবর্তী যুগে চেতবংশীয় রাজা খারবেল এবং সাতবাহন রাজগণ প্রাধান্য বিস্তার করেন। গুপ্তসম্রাট সমুদ্র গুপ্ত দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন শাসকদিগের নিকট হইতে আনুগত্য আদায় করেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর চালুক্যরাজগণ একটি শক্তিশালী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। দক্ষিণ ভারতে যে সকল রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

চালুক্য বংশ: চালুক্য বংশীয় প্রথম পুলকেশী বাতাপিকে কেন্দ্র করিয়া চালুক্য শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পুত্র প্রথম কীর্তিবর্মন এবং মঙ্গলেশ চালুক্যরাজ্যের শক্তি ও ভূখণ্ড বৃদ্ধি করেন। কীর্তিবর্মনের পুত্র দ্বিতীয় পুলকেশী ছিলেন এই বংশের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শাসক। তিনি দক্ষিণ গুজরাট, মালব, কোঙ্কন এবং মহীশূর পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেন। চোল, কেরল এবং পাণ্ড্যরাজ তাঁহার আনুগত্য স্বীকার

দ্বিতীয় পুলকেশী

করেন। পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মন তাঁহার নিকট পরাজিত হন। তিনি পল্লব রাজ্যের রাজধানী কাঞ্চী নগরী অধিকার করেন।

সাফল্য

দ্বিতীয় পুলকেশীর প্রতাপে হর্ষবর্ধনের পক্ষে নর্মদা নদীর দক্ষিণে আধিপত্য বিস্তার করা সম্ভব হয় নাই। হর্ষবর্ধন পুলকেশীর নিকট পরাজয় স্বীকার করেন। হর্ষের পরাজয় হইতে চালুক্যরাজের সামরিক শক্তির বিষয় অনুমান করা যায়।

পরাজয় ও মৃত্যু

দ্বিতীয় পুলকেশী পারস্যরাজের সহিত মিত্রতা স্থাপনের জন্য দূত প্রেরণ করেন। প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্ তাঁহার ঐশ্বর্য এবং শক্তির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার পরাক্রম দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কাঞ্চীর পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মনের পুত্র নরসিংহবর্মনের নিকট পরাজিত এবং নিহত হন। পল্লববাহিনী চালুক্যদের রাজধানী বাতাপি নগরী ধ্বংস করে। চালুক্য বংশের প্রভাব সাময়িকভাবে হ্রাস পায় এবং পল্লব প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

চালুক্য-পল্লব সংগ্রাম

দ্বিতীয় পুলকেশীর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য চালুক্য শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পল্লবরাজ নরসিংহ-বর্মনকে পরাজিত করিয়া পল্লব-রাজধানী কাঞ্চী অধিকার করেন। চোল, কেরল এবং পাণ্ড্যরাজগণ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন।

দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য

বাতাপির চালুক্য বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য শাসক ছিলেন দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য। তিনিও পল্লবরাজকে পরাজিত করিয়া পল্লব রাজধানী অধিকার করেন। চোল ও পাণ্ড্যরাজগণ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন। তিনি সিন্ধুর আরবদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া প্রভূত সামরিক খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি বিখ্যাত বিরূপাক্ষ মন্দির নির্মাণ করাইয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।

দীর্ঘদিন চালুক্য এবং পল্লবগণের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে উভয়

রাজ্যই দুর্বল হইয়া পড়ে। রাষ্ট্রকূটগণ ঐ দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় কীর্তিবর্মন রাষ্ট্রকূট রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা দন্তিদুর্গের নিকট পরাজিত হইলে বাতাপির চালুক্য শাসনের অবসান ঘটে।

বাতাপির চালুক্যবংশের শাসনের অবসান ঘটিলেও ঐ বংশের একটি শাখা দশম শতকে কল্যাণে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। কল্যাণের চালুক্য শাসনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দ্বিতীয় তৈল। তাঁহার রাজধানী মান্যখেটে অবস্থিত ছিল। কল্যাণের চালুক্যরাজগণের সহিত পরমার এবং চোল রাজগণের দীর্ঘকাল সংগ্রাম চলিয়াছিল।

কল্যাণের চালুক্য বংশ

কল্যাণের চালুক্যবংশীয় শাসক সোমেশ্বর মালব, চোল এবং চেদীরাজ কর্ণকে পরাজিত করেন এবং পল্লব রাজধানী কাঞ্চী আক্রমণ করেন। তাঁহার পুত্র ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য চোল-রাজকে পরাজিত করেন এবং পাল রাজগণের দুর্বলতার সুযোগে বাংলার একাংশ অধিকার করেন। বিখ্যাত গ্রন্থকার বিহ্লন এবং আইন প্রণেতা বিজ্ঞানেশ্বর তাঁহার রাজসভা অলংকৃত করিতেন। দ্বাদশ শতকে কল্যাণের চালুক্য বংশের শাসনের অবসান ঘটে।

সোমেশ্বর ও ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য

চালুক্যরাজগণ ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা জৈন ধর্মেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহাদের সময়ে বৌদ্ধ ধর্মেরও অস্তিত্ব ছিল। হিউয়েন-সাঙ-এর রচনা হইতে এই তথ্য জানা যায়। হিউয়েন-সাঙ শতাধিক বৌদ্ধ মঠের অস্তিত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। চালুক্য শাসনকালে পর্বতগাত্র খোদাই গুহা-মন্দির নির্মাণের পদ্ধতির প্রচলন হয়। অজন্তার গুহা-চিত্রের কয়েকটি চালুক্য আমলে অঙ্কিত বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়া থাকেন। বিখ্যাত গ্রন্থকার বিহ্লন 'বিক্রমাঙ্কচরিত' রচনা করেন এবং হিন্দু উত্তরাধিকার সংক্রান্ত 'মিতাক্ষরা' আইন প্রণেতা বিজ্ঞানেশ্বর কল্যাণের চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।

রাষ্ট্রকূট বংশ ঃ রাষ্ট্রকূট বংশীয় শাসনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দন্তিদুর্গ। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে চালুক্য-বংশীয় শাসক দ্বিতীয় কীর্তিবর্মনকে পরাজিত করিয়া তিনি রাষ্ট্রকূট শাসনের সূত্রপাত করেন। কাঞ্চী, দক্ষিণ কোশল, দক্ষিণ গুজরাট এবং মালবে তিনি সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন।

দন্তিদুর্গের ভ্রাতা প্রথম কৃষ্ণ পরাক্রমশালী শাসক ছিলেন। তিনি বেঙ্গী এবং মহীশূরের রাজগণকে পরাজিত করেন এবং কোঙ্কন অধিকার করেন। তিনি কেবল সামরিক শক্তিরই অধিকারী ছিলেন না, শিল্পের পৃষ্ঠপোষকরূপেও

প্রথম কৃষ্ণ

কৈলাসনাথ মন্দির

তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ইলোরার বিখ্যাত **কৈলাসনাথ মন্দির** নির্মাণ করাইয়াছিলেন। মন্দিরটি প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন।

রাষ্ট্রকূট বংশের অপর শক্তিশালী রাজা ছিলেন ধ্রুব। তিনি গঙ্গারাজের রাজ্য অধিকার করেন। কাঞ্চীর পল্লবগণও তাঁহার নিকট পরাজিত হন। ধ্রুব কেবল দক্ষিণ ভারতে প্রভাব সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিবার পরিবর্তে উত্তর ভারতেও আধিপত্য বিস্তার করিতে আগ্রহী হন। তিনি গুর্জর-প্রতিহাররাজ বৎসরাজকে পরাজিত করেন। পালরাজ ধর্মপালও তাঁহার নিকট নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হন।

ধ্রুব ও আর্যাবর্ত

ধ্রুবর পরবর্তী রাষ্ট্রকূট রাজ তৃতীয় গোবিন্দ ঐ বংশের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শাসক ছিলেন। তাঁহার আমলে রাষ্ট্রকূট রাজ্যের সীমা চরম বিস্তার লাভ করে। তিনি পল্লবরাজকে পরাজিত করেন। ধ্রুবর ন্যায় তিনিও উত্তর ভারতের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি শক্তিশালী গুর্জর-প্রতিহার রাজ দ্বিতীয় নাগভট্টকে পরাজিত করেন। তাঁহার পরাক্রমের নিকট শক্তিশালী পালরাজ ধর্মপাল এবং তাঁহার আশ্রয়ভাজন কনৌজের চক্রায়ুধ নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হন।

তৃতীয় গোবিন্দ কর্তৃক প্রাধান্য বিস্তার

তৃতীয় গোবিন্দের পর তাঁহার পুত্র প্রথম অমোঘবর্ষ রাজা হন। তিনিও পরাক্রমশালী শাসক ছিলেন। তিনি বেঙ্গীর শাসককে পরাজিত করেন। তিনি শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকরূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মণ্যধর্মে অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি জৈন ধর্মেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি স্বয়ং 'রত্নমালিকা' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া সাহিত্যিকের মর্যাদা-লাভ করেন। প্রসিদ্ধ আরব পর্যটক সুলেমান তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। সুলেমান তাঁহাকে চীনের সম্রাট, বাগদাদের খলিফা, এবং কনস্ট্যান্টিনোপল বা রোমের সম্রাটের সমমর্যাদার অধিকারীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রথম অমোঘবর্ষ

অমোঘবর্ষের পর রাজা হন দ্বিতীয় কৃষ্ণ, ইনি পরাক্রমশালী শাসক ছিলেন না। ফলে চালুক্য এবং পরমার উভয় রাজবংশই

শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকে। দ্বিতীয় কৃষ্ণ মধ্য ভারতের কলচুরিগণের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন।

তৃতীয় ইন্দ্র ও আর্যাবর্ত

দ্বিতীয় কৃষ্ণের পর রাজা হন তৃতীয় ইন্দ্র। তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী শাসক ছিলেন। তিনি ধ্রুব এবং তৃতীয় গোবিন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিতে আগ্রহী হন। তিনি ৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে গুর্জর-প্রতিহারদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের রাজধানী কনৌজ অধিকার এবং লুণ্ঠন করিয়া গুর্জর-প্রতিহারগণের শক্তির উপর প্রবল আঘাত করেন। তিনি চোলদিগকেও পরাজিত করেন। তাঁহার পরবর্তী কয়েকজন শাসক দুর্বল ছিলেন ফলে রাষ্ট্রকূটগণের প্রাধান্য হ্রাস পাইতে থাকে।

তৃতীয় কৃষ্ণের পর রাষ্ট্রকূট প্রাধান্যের অবসান

রাষ্ট্রকূট বংশের শেষ পরাক্রমশালী শাসক ছিলেন তৃতীয় কৃষ্ণ। তিনি প্রতিহাররাজ মহীপালকে পরাজিত করেন। তিনি কালঞ্জর এবং চিত্রকূট অধিকার করেন। পল্লব, পাণ্ড্য, চোল এবং সিংহলরাজও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রাষ্ট্রকূট রাজ্যের পতনের সূত্রপাত হয়। পরমাররাজ হর্ষ রাষ্ট্রকূট রাজধানী অধিকার করেন। দশম শতকে চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় তৈলপ রাষ্ট্রকূট প্রাধান্যের অবসান ঘটাইয়া চালুক্য প্রাধান্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

পল্লব বংশঃ সাতবাহন বংশের পতনের পর দাক্ষিণাত্যে পল্লবগণের নেতৃত্বে একটি বিশাল এবং শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসে পল্লবগণের শাসনকাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

পল্লবগণের উৎপত্তি সম্পর্কে আজিও কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হয় নাই।

প্রথম উল্লেখযোগ্য পল্লবরাজের নাম শিবস্কন্দবর্মন। বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তাঁহার আধিপত্য বজায় ছিল। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে পল্লবরাজ বিষ্ণুগোপ গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের অধীনতা

স্বীকার করেন। পরবর্তী দুই শতাব্দীতে পল্লবগণের বিষয় বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তবে পঞ্চম শতকের প্রথমার্ধে সিংহবর্মন নামে জনৈক পল্লবরাজের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

ষষ্ঠ শতকের শেষ ভাগে পল্লবরাজ ছিলেন সিংহবিষ্ণু। তিনি পরাক্রমশালী শাসক ছিলেন। চের, চোল, পাণ্ড্য এবং সিংহলের অধিপতিগণ তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন।

প্রথম মহেন্দ্রবর্মন

সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে প্রথম মহেন্দ্রবর্মন পল্লব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি 'মত্তবিলাস' নামক গ্রন্থটি রচনা করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি স্থাপত্যেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার আগ্রহে ত্রিচিনাপল্লীতে বহু সুন্দর সুন্দর মন্দির নির্মিত হয়। তিনি বাতাপির চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর নিকট পরাজিত হন। অল্পকাল পরেই তাঁহার পুত্র নরসিংহবর্মন দ্বিতীয় পুলকেশীকে পরাজিত ও নিহত করিয়া বাতাপি অধিকার করেন। নরসিংহবর্মন ছিলেন পল্লবগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শাসক। তিনি পাণ্ড্য এবং সিংহলে আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁহার পূর্বে অপর কোন পল্লববংশীয় শাসক ঐরূপ বিশাল ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহার রাজত্বকালে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্ দাক্ষিণাত্যে আগমন করেন। তিনি তাঁহার রচনায় পল্লব রাজ্য এবং কাঞ্চী সম্পর্কে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা বিশেষ মূল্যবান।

নরসিংহবর্মন

নরসিংহবর্মন কেবলমাত্র শক্তিশালী শাসক ছিলেন না। তিনি শিল্প ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষকরূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার আমলে মহাবলীপুরমের বিখ্যাত মন্দির নির্মিত হয়।

সপ্তম এবং অষ্টম শতকে চালুক্যরাজগণের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ এবং আত্মকলহের ফলে পল্লবগণ দুর্বল হইয়া পড়ে। পল্লবরাজ প্রথম পরমেশ্বরবর্মন চালুক্যরাজ প্রথম বিক্রমাদিত্যের নিকট পরাজিত হন।

কাঞ্চী চালুক্যগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়। পল্লবরাজ দ্বিতীয় নন্দীবর্মনও চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের নিকট পরাজিত হন। নন্দীবর্মন রাষ্ট্রকূটগণের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া চালুক্যগণের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয়ের যে প্রচেষ্টা করেন তাহা ব্যর্থ হয়।

পল্লবদের দুর্বলতা

পল্লবরাজ দন্তিবর্মনকে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ পরাস্ত করেন। পল্লববংশের শেষ শাসক অপরাজিত বর্মনকে পরাজিত করিয়া পল্লব শাসনের অবসান ঘটাইয়াছিলেন চোলবংশীয় আদিত্য।

পল্লব শাসনের অবসান

পল্লবগণ কেবল শক্তিশালী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না, তাঁহারা ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য ও শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। পল্লব-রাজগণ পরধর্ম-সহিষ্ণুও ছিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ্যধর্মে অনুরক্ত হইলেও অপর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

পল্লব শাসনকালে দক্ষিণ ভারতে শিল্প ও স্থাপত্যের অভাবনীয় উন্নতি ঘটে। মহেন্দ্র বর্মনের আমলে পাথর খুদিয়া মন্দির নির্মাণের রীতির প্রচলন হয়। পল্লবরাজ নরসিংহবর্মনের সময়ে মহাবলীপুরমের (মামল্লপুরম) প্রসিদ্ধ মন্দির এবং 'সপ্তরথ' নির্মিত হয়। সমুদ্রতীরের ঐ মন্দিরগুলি এবং কাঞ্চী এবং অন্যান্য স্থানের মন্দিরগুলি এবং মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্য ঐ যুগের শিল্পের উন্নতির সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

শিল্প

পল্লবরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় পল্লব রাজধানী কাঞ্চী ব্রাহ্মণ্যধর্মের এবং সংস্কৃত শিক্ষার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্রে পরিণত হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে বিদ্যাচর্চার জন্য প্রতিবৎসর কাঞ্চীতে বহু শিক্ষার্থীর সমাগম হইত।

ধর্ম

পল্লবরাজগণ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী ভারবি পল্লবরাজ সিংহবিষ্ণুর রাজসভা অলংকৃত করিতেন। ভারবি 'কিরা-তার্জুনীয়ম্' রচনা করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। প্রসিদ্ধ

সাহিত্য

আলংকারিক দণ্ডী সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্রবর্মন স্বয়ং সাহিত্যসেবী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি 'মত্তবিলাস' নামক গ্রন্থটি রচনা করেন।
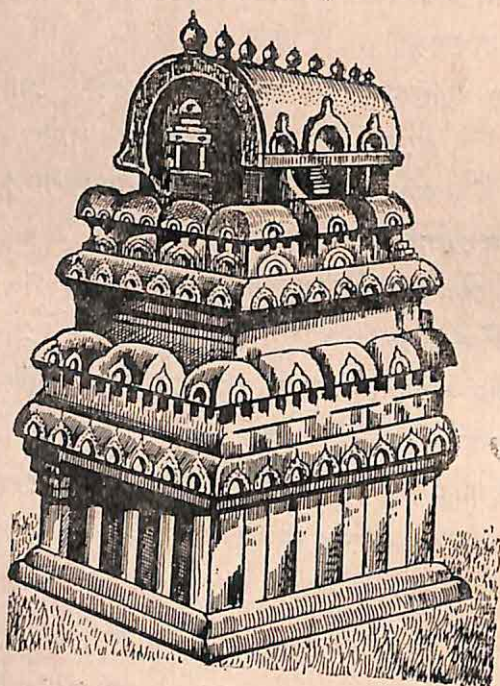
মহাবলীপুরমের মন্দির
(পল্লব রথ)

চোল বংশঃ অতি প্রাচীনকাল হইতেই চোলগণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কাত্যায়নের গ্রন্থে এবং অশোকের লিপিতেও চোলগণের উল্লেখ রহিয়াছে। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে চোলবংশীয় কারিকল চের, পাণ্ড্য এবং সিংহল পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেন। কিন্তু চের রাজ্যের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পল্লব রাজ্যের উত্থানের ফলে চোলগণের শক্তি হ্রাস পায়। চোলগণ পল্লবগণের নিকট অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। অষ্টম শতকে পল্লবগণ দুর্বল হইয়া পড়িলে চোলগণ পুনরায় স্বাধীন হইয়া পড়ে।

প্রাচীন ইতিহাস

চোলবংশীয় বিজয়লাল খ্রীষ্টীয় নবম শতকের মধ্যভাগে পল্লবগণের অধীনতা অস্বীকার করিয়া স্বাধীন চোল রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার রাজধানী ছিল তাঞ্জোর। বিজয়লালের পর তাঁহার পুত্র প্রথম আদিত্য পল্লবরাজ অপরাজিত বর্মনকে পরাজিত করিয়া পল্লব শাসনের অবসান ঘটান। কথিত আছে তিনি গঙ্গারাজকেও পরাজিত করেন। তাঁহার সময়ে মাদ্রাজ হইতে কাবেরী নদী পর্যন্ত চোল-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল।

স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা

প্রথম আদিত্যের পুত্র প্রথম পরন্তকও শক্তিশালী শাসক ছিলেন। তিনি পাণ্ড্যরাজকে পরাজিত করিয়া পাণ্ড্য রাজধানী মাদুরা অধিকার করেন। সিংহলেও তাঁহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণ এবং গঙ্গারাজ যৌথভাবে চোলরাজ্য আক্রমণ করিলে তিনি পরাস্ত হন। তাঞ্জোর এবং কাঞ্চীর পতন ঘটে। চোল প্রাধান্যের সাময়িক অবসান ঘটে।

চোল প্রাধান্যের সাময়িক অবসান

দশম শতকের শেষভাগে প্রথম রাজরাজ চোল বংশের লুপ্ত মর্যাদার পুনরুদ্ধার করেন। রাজরাজ চের, পাণ্ড্য, সিংহলের উত্তরাংশ এবং মহীশূরের অংশবিশেষ অধিকার করেন। তিনি সম্ভবতঃ কলিঙ্গ আক্রমণ করেন। বেঙ্গীর চালুক্যরাজকে পরাজিত করেন। তাঁহার শক্তিশালী নৌবাহিনী ছিল।

রাজরাজ কর্তৃক চোল প্রাধান্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

রাজরাজ কেবল সামরিক শক্তির অধিকারী ছিলেন না। তিনি ধর্ম এবং সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকরূপেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ছিলেন শিবের উপাসক, তাঁহার আমলে তাঞ্জোরের প্রসিদ্ধ রাজরাজেশ্বর মন্দির নির্মিত হয়। রাজরাজ পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের জন্য তিনি নেগাপত্তমে বৌদ্ধমন্দির নির্মাণের অনুমতিদান করেন।

রাজরাজের পুত্র রাজেন্দ্রচোলদেব চোল বংশের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শাসক ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে চোল-সাম্রাজ্য

গৌরবের চরম শীর্ষে আরোহণ করে। তিনি কল্যাণের চালুক্যরাজ, গঙ্গারাজ এবং বাংলার পালবংশীয় শাসক মহীপালকে পরাজিত করেন। তিনি উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন। গঙ্গার তটভূমি বিজয় স্মরণীয় করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে তিনি 'গঙ্গাইকোণ্ডা' উপাধি ধারণ করেন এবং 'গঙ্গাইকোণ্ড চোলপুরম' নামক নূতন রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেন। পিতার ন্যায় তাঁহারও শক্তিশালী নৌবাহিনী ছিল। নৌবাহিনীর সাহায্যে তিনি আন্দামান, নিকোবর, ব্রহ্মের পেগু, মালয়, সুমাত্রা এবং যবদ্বীপে আধিপত্য বিস্তার করেন। রাজেন্দ্রচোলদেব ব্যতীত অপর কোন ভারতীয় শাসক এত দূরদেশে আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হন নাই।

রাজেন্দ্রচোলদেবের দিগ্‌বিজয়

রাজেন্দ্রচোলদেবের পর তাঁহার পুত্র প্রথম রাজাধিরাজ চোল সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তিনি কল্যাণের চালুক্যরাজ সোমেশ্বর কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। তাঁহার ভ্রাতা দ্বিতীয় রাজেন্দ্রের আমলেও চালুক্যগণের সহিত সংগ্রাম চলিতে থাকে। পরবর্তী চোলরাজ বীর রাজেন্দ্রও চালুক্যগণের সহিত যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন। তিনি চালুক্যরাজ সোমেশ্বর এবং দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যকে পরাজিত করেন। তিনি কেরল এবং পাণ্ড্যে বিদ্রোহ দমন করেন এবং সিংহল ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে চোল আধিপত্য বজায় রাখেন। তাঁহার পর তাঁহার পুত্র অধিরাজেন্দ্র রাজা হন। তিনি অপ্রিয় শাসক ছিলেন ফলে প্রজা-বিদ্রোহে তাঁহার মৃত্যু হয়। অতঃপর রাজেন্দ্র কুলোতুঙ্গের নেতৃত্বে এক নূতন বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার পিতা চালুক্য এবং মাতা ছিলেন চোল বংশীয়া, ঐ কারণে ঐ নূতন শাসন চোল-চালুক্য বংশীয় শাসন নামে পরিচিত। তিনি কলিঙ্গ অধিকার করেন। তাঁহার পর আরও ছয় জন রাজত্ব করেন। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে হোয়সল, পাণ্ড্য, কাকতীয় প্রভৃতি স্বাধীন হইয়া যায়। ১৩১০

চোল-চালুক্য সংগ্রাম

চোল-চালুক্য বংশের শাসন

খ্রীষ্টাব্দে চোল রাজ্য দিল্লীর সুলতানের সেনাপতি মালিক কাফুর জয় করেন। চোল রাজ্যের স্বাধীন অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটে।

চোলগণ উন্নত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। রাজা ছিলেন চোল সাম্রাজ্য শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে। শাসনের সুবিধার জন্য কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রদেশকে মণ্ডলম্ বলা হইত। প্রদেশের নিম্নতর ভাগকে কোট্টম বলা হইত। কোট্টম কয়েকটি জেলার সমন্বয়ে গঠিত ছিল। জেলাগুলিকে নাডু বলা হইত। নাড়ু কয়েকটি গ্রাম বা কুররমের সমন্বয়ে গঠিত ছিল।

চোল রাজ্যের পতন

শাসন-ব্যবস্থা

রাজরাজেশ্বর (শিব) মন্দির

স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থারও অস্তিত্ব ছিল। প্রতিটি কুররমে প্রতিনিধি সভা ছিল। প্রতিনিধি সভা শাসনকার্য পরিচালনা করিত। সুদক্ষ ভূমি রাজস্ব প্রথারও অস্তিত্ব ছিল।

চোল রাজগণ শিল্প ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঞ্জোর এবং গঙ্গাইকোণ্ডা চোল-পুরমের বিশাল মন্দিরগুলি চোল শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। রাজরাজ চোলের আমলে নির্মিত তাঞ্জোরের রাজরাজেশ্বর (শিব) মন্দিরটির ন্যায় সুউচ্চ মন্দির ভারতের অন্য কোন স্থানে দেখা যায় না।

শিল্প

অনুশীলনী

১। চালুক্য রাজগণের ইতিহাস লিখ।

২। রাষ্ট্রকূট রাজগণের কার্যকলাপের বিবরণ দাও।

৩। পল্লব রাজগণের কীর্তি-কলাপ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৪। চোল রাজগণের কার্যকলাপের বিবরণ দাও।

৫। **টীকা লিখ ঃ**

(ক) দ্বিতীয় পুলকেশী, (খ) পল্লব শিল্প, (গ) রাজেন্দ্র চোলদেব, (ঘ) চোল-চালুক্য বংশ, (ঙ) চোল শাসন-পদ্ধতি।

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

(ক) দ্বিতীয় পুলকেশীর সহিত আর্যাবর্তে যে বিখ্যাত নরপতির বিরোধ বাধে তাঁহার নাম উল্লেখ কর।

(খ) পল্লব রাজ্যের রাজধানীর নাম কি ছিল ?

(গ) রাজেন্দ্র চোলদেব কি উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন ?

(ঘ) রাজরাজেশ্বর মন্দির কোথায় ? নির্মাতার নাম উল্লেখ কর।

(ঙ) 'মত্তবিলাস' গ্রন্থের রচয়িতা কে ছিলেন ?

(চ) ভারবি রচিত বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম কি ?

———

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

হজরৎ মহম্মদ ও তাঁহার ধর্মমত

এশিয়া মহাদেশের পশ্চিমাংশে প্রধানতঃ মরুময় ভূখণ্ড আরবদেশ। আরবগণ বহু দেবতার উপাসনা করিত। তাহারা ছিল পৌত্তলিক। আরবগণের বহু দল এবং উপদল ছিল। তাহাদের মধ্যে কোয়ারিশ সম্প্রদায় বিশেষ প্রভাবশালী ছিল। কোয়ারিশগণের মক্কার কাবার মন্দির পরিচালনায় একাধিপত্য ছিল।

আরবদেশে মক্কা নগরীতে ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে হজরৎ মহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আবহুল্লা। তিনি কোয়ারিশ বংশোদ্ভূত। মহম্মদের জন্মের কয়েকমাস পূর্বেই পিতা মারা যান এবং তিনি ছয় বৎসর বয়সে মাতৃহারা হন। তাঁহার পিতৃব্য তাঁহাকে প্রতিপালন করেন এবং বাণিজ্য করিবার জন্য শিক্ষাদান করিতে থাকেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য মহম্মদকে নানাদেশ ভ্রমণ করিতে হইত, ফলে বিভিন্ন জাতির লোকের সহিত মেলামেশার সুযোগ লাভ করেন।

জীবনী

মহম্মদের আর্থিক অবস্থা ভাল না থাকায় তিনি খাদিজা নামক এক বিত্তশালিনী মহিলার অধীনে কর্মগ্রহণ করেন এবং ভবিষ্যতে তিনি খাদিজাকে বিবাহ করেন। বিবাহের ফলে মহম্মদের আর্থিক দুশ্চিন্তার অবসান ঘটে। তিনি ঈশ্বর-চিন্তায় মগ্ন হন। প্রায় ৫০ বৎসর বয়সে মহম্মদ ঈশ্বর সম্বন্ধে উপলব্ধি করিয়া এক নূতন ধর্ম প্রচার করেন। ঐ নূতন ধর্মমত **ইসলাম** নামে পরিচিত।

ধর্মমত প্রচার

মহম্মদ সর্বপ্রথম তাঁহার পত্নীর নিকট তাঁহার ধর্মমত প্রকাশ করেন। তিন বৎসর পরে তিনি প্রকাশ্যে তাঁহার ধর্মমত প্রচার করিতে থাকেন।

মহম্মদ বহু দেবতার আরাধনা, মূর্তি পূজার নিন্দা করিতে থাকেন। ফলে তাঁহার বহু শত্রু জন্মে। মহম্মদ বলিতেন ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ (পয়গম্বর)।

মক্কাবাসিগণ মহম্মদের ধর্মমতে উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে থাকিলে তিনি মক্কা ত্যাগ করিয়া মদিনায় গমন করেন।

হিজিরাব্দ

ঐ ঘটনা হইতে মুসলমানী বৎসর বা হিজিরাব্দ গণনা করা হয়। মদিনায় মহম্মদের অনুগামীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ সসৈন্যে মক্কা যাত্রা করিয়া কোয়ারিশদের পরাজিত করিয়া মক্কা অধিকার করেন।

মক্কা অধিকারের পর তিনি জনগণকে বহু দেবতার আরাধনা এবং মূর্তিপূজা হইতে নিবৃত্ত হইতে এবং আল্লাহকে উপাসনা করিতে উপদেশ দান করেন। মক্কা ও মদিনার অগণিত নরনারী মহম্মদের প্রচারিত ধর্মমত গ্রহণ করিতে থাকে। ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদের দেহাবসান ঘটে।

মহম্মদের ধর্মমত ছিল সরল এবং অনাড়ম্বর। তিনি ইসলাম ধর্মাবলম্বীদিগকে পাঁচটি নির্দেশনামা পালন করিবার উপদেশ দান করেন। ঐ পাঁচটি উপদেশ ছিল। (১) কল্‌মা (ধর্মবিশ্বাসকে স্বীকৃতিদান), (২) নামাজ (প্রার্থনা), (৩) জাকৎ (ভিক্ষা), (৪) রমজান (উপবাস) এবং (৫) হজ (মক্কায় তীর্থযাত্রা)।

ধর্মবিষয়ক নির্দেশনামা

মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার কয়েকজন প্রধান শিষ্য তাঁহার প্রতিনিধি (খালিফা)-রূপে ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে দিগ্বিজয়ে বাহির হন। তাঁহাদের প্রচেষ্টায় এশিয়া, আফ্রিকা এমন কি ইওরোপের বহু দেশেও ইসলাম ধর্ম এবং ইসলাম ধর্মাবলম্বী (মুসলমান) গণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইসলামের প্রচার

অনুশীলনী

১। হজরৎ মহম্মদের সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। হজরৎ মহম্মদের জীবনী এবং ইসলাম-এর উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা কর।

মৌখিক প্রশ্ন :

(ক) হজরৎ মহম্মদের জন্মস্থানের নাম উল্লেখ কর।

(খ) হিজিরাব্দ কোন্ ঘটনা হইতে গণনা করা হইয়া থাকে।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতে মুসলমান আক্রমণ ও সুলতানী শাসনের প্রতিষ্ঠা

ভারতে সর্বপ্রথম মুসলমান শাসনের প্রতিষ্ঠা হয় সিন্ধুতে। অষ্টম শতকের সূচনায় সিন্ধুর ব্রাহ্মণ রাজা দাহিরকে পরাজিত করিয়া মুসলমান রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পথ রচনা করেন ইরাকের শাসনকর্তা হাজ্জাজের সেনাপতি মহম্মদ বিন কাসিম।

আরব আক্রমণ

দশম শতকে গজনীর সুলতান সবুক্তগীন (গজনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আলপ্তগীনের জামাতা এবং পরবর্তী সুলতান) উদভাণ্ড-পুরের হিন্দুশাহী রাজা জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করেন। জয়পাল এবং সবুক্তগীনের মধ্যে সংঘর্ষের বিষয় পূর্বেই (তৃতীয় অধ্যায়ে) আলোচনা করা হইয়াছে। জয়পাল সবুক্তগীনের বিরুদ্ধে একাধিকবার ব্যর্থ হন।

সবুক্তগীন

গজনীর সুলতান মামুদের আক্রমণঃ সবুক্তগীন ৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। সবুক্তগীনের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মামুদ তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং পিতার মনোনীত উত্তরাধিকারীকে পরাজিত করিয়া ৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দে গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ১০০০—১০২৬-এর মধ্যে অন্যূন ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন। ভারতের ইতিহাসে মামুদ প্রধানতঃ লুণ্ঠনকারী হিসাবেই পরিচিত।

সিংহাসন লাভ

মামুদের সতেরটি আক্রমণের মধ্যে শাহী রাজগণের বিরুদ্ধে অভিযান, গুর্জর-প্রতিহার, চন্দেল্লরাজ এবং সোমনাথ আক্রমণ উল্লেখযোগ্য।

মামুদ ১০০১ খ্রীষ্টাব্দে শাহীরাজ জয়পালকে পরাজিত করেন। জয়পাল সবুক্তগীন এবং মামুদের নিকট পরাজয়ের গ্লানিতে আত্মহত্যা করেন। মামুদ ১০০৬ খ্রীষ্টাব্দে মূলতান আক্রমণ করেন এবং

মূলতানের শাসক সন্ধি করেন। ১০০৮ খ্রীষ্টাব্দে মামুদ জয়পালের পুত্র আনন্দপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। আনন্দপাল উজ্জয়িনী, গোয়ালিয়র, কালঞ্জর, কনৌজ, দিল্লী ও আজমীরের শাসকগণের নিকট হইতে সাহায্যলাভ করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি পরাজিত হন।

শাহীরাজ্য

সুলতান মামুদ

মামুদ ১০১০ খ্রীষ্টাব্দে মূলতানের শাসককে পরাজিত করেন। মামুদ ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে থানেশ্বর আক্রমণ করিয়া শহরটি লুণ্ঠন করেন। পর বৎসর মামুদ যমুনা নদী অতিক্রম করেন এবং মথুরা লুণ্ঠন করেন। মামুদ ১০১৯ খ্রীষ্টাব্দে কনৌজ আক্রমণ করিলে গুর্জর-প্রতিহার বংশীয় শাসক রাজ্যপাল বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করেন। কনৌজ লুণ্ঠিত হয়। মামুদের পরবর্তী আক্রমণের লক্ষ্য ছিলেন চন্দেল্লরাজ বিদ্যাধর। যুদ্ধের বিবরণ জানা যায় না।

মূলতান, থানেশ্বর, মথুরা, কনৌজ ও চন্দেল্লরাজকে আক্রমণ

১০২৫-২৬ খ্রীষ্টাব্দে মামুদ পাটনের বিখ্যাত সোমনাথের মন্দিরটি ধ্বংস এবং প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এই অভিযানই তাঁহার সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য অভিযান। ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে মামুদের মৃত্যু হয়।

সোমনাথ লুণ্ঠন

মামুদ কেবল সুদক্ষ সেনানায়ক, সাহসী যোদ্ধা এবং লুণ্ঠনকারী ছিলেন না। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। 'শাহনামা' রচয়িতা প্রসিদ্ধ কবি ফিরদৌসী তাঁহার সভাকবি ছিলেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত

অল্-বেরুনী তাঁহার একজন অন্তরঙ্গ সুহৃদ এবং সভাসদ্ ছিলেন।

কৃতিত্ব

মামুদ গজনীতে বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থাগার এবং সংগ্রহশালার প্রতিষ্ঠা করেন। লুণ্ঠিত ধনরত্ন ব্যয় করিয়া তিনি গজনী নগরীর শ্রীবৃদ্ধি করেন।

মহম্মদ ঘোরী ঃ সুলতান মামুদের মৃত্যুর পর গজনীর পতনের সূত্রপাত হয়। আফগানিস্তানের পশ্চিম অঞ্চলে ঘোর রাজ্যের শাসকগণ গজনীর অধীনতা অস্বীকার করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ঘোরের অধিপতি গিয়াসউদ্দীনের ভ্রাতা শিহাবউদ্দীন ভারতের ইতিহাসে মহম্মদ ঘোরী নামে পরিচিত। মহম্মদ ঘোরী প্রথমে ভারতের উত্তর পশ্চিমের কিছু স্থান অধিকার করেন। মহম্মদ ঘোরী যখন ভারত আক্রমণ করেন সেই সময়ে উত্তর ভারতে কয়েকটি শক্তিশালী রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু ঐ সকল রাজ্যের রাজাদের মধ্যে একতা ছিল না, দিল্লী ও আজমীরের চৌহান বংশীয় শাসক পৃথ্বীরাজের সহিত কাশী ও কনৌজের গাহাড়বাল বংশীয় শাসক জয়চন্দ্রের প্রবল শত্রুতা ছিল।

মহম্মদ ঘোরী

মহম্মদ ঘোরী ১১৯০-৯১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে পৃথ্বীরাজ দুই লক্ষ অশ্বারোহী ও তিন সহস্র হস্তিবাহিনী লইয়া মহম্মদের সম্মুখীন হন। পৃথ্বীরাজকে কয়েকজন রাজপুত শাসক সাহায্য দান করেন। কিন্তু জয়চন্দ্র নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকেন, তরাইনের যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরী পরাজিত হইয়া এদেশ পরিত্যাগ করেন। কিন্তু পর বৎসর তরাইনের যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ পরাজিত হন। জয়চন্দ্রের ভাগ্যেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। মহম্মদ

ঘোরীর প্রতিনিধি কুতুবউদ্দীন আইবক হাবসী, মীরাট, দিল্লী ও রন্থম্ভোর অধিকার করেন। বকতিয়ার খলজী নামক অপর এক পাঠান সেনাপতি পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার জয় করেন। এইভাবে মহম্মদ ঘোরী এবং তাঁহার অনুচরদের প্রচেষ্টায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভারতের এক বৃহৎ অংশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

দিল্লীর দাসবংশীয় শাসকগণ ঃ প্রতিষ্ঠাতা কুতবউদ্দীন ঃ— দিল্লীর দাসবংশীয় শাসনের সূচনা করেন কুতবউদ্দীন আইবক। মহম্মদ ঘোরীর কোন পুত্রসন্তান ছিল না। সেই কারণে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার অধিকৃত ভূখণ্ড তাঁহার অনুচরগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। দিল্লী ও সন্নিহিত ভূখণ্ড লাভ করেন মহম্মদ ঘোরীর বিশ্বস্ত অনুচর কুতবউদ্দীন আইবক। তিনি প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। উল্লেখযোগ্য শাসক ইলতুৎমিস ও বলবনও প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন—সম্ভবতঃ ঐ কারণে কুতবউদ্দীনের প্রতিষ্ঠিত শাসন **দাসবংশীয়** শাসন নামে পরিচিত।

দাসবংশের প্রতিষ্ঠা

কুতবউদ্দীন আইবক

কুতবউদ্দীন আপন প্রতিভাবলে মহম্মদ ঘোরীর বিশ্বাস অর্জন করিতে সক্ষম হন। মহম্মদ ঘোরী স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সময়ে তাঁহাকে বিজিত ভারতীয় ভূখণ্ডের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কুতবউদ্দীন মহম্মদ ঘোরীর প্রতিনিধিরূপে দিল্লী, রন্থম্ভোর, কোইল প্রভৃতি জয় করেন। তাঁহার এক প্রতিনিধি ইখতিয়ারউদ্দীন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গ জয় করেন।

১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে কুতবউদ্দীন সুলতান হইয়া নূতন ভূখণ্ড জয় না করিয়া অধিকৃত ভূখণ্ডে আপন আধিপত্য সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। অবশ্য সুলতান হইবার পরই তিনি ৪০ দিনের জন্য গজনী অধিকার করেন।

কুতবউদ্দীনের জীবন ও কৃতিত্ব

তিনি ছিলেন একাধারে নির্মম এবং দানশীল। দানশীলতার জন্য তিনি 'লাখবকস্' (লক্ষমুদ্রাদাতা) নামে পরিচিত ছিলেন।
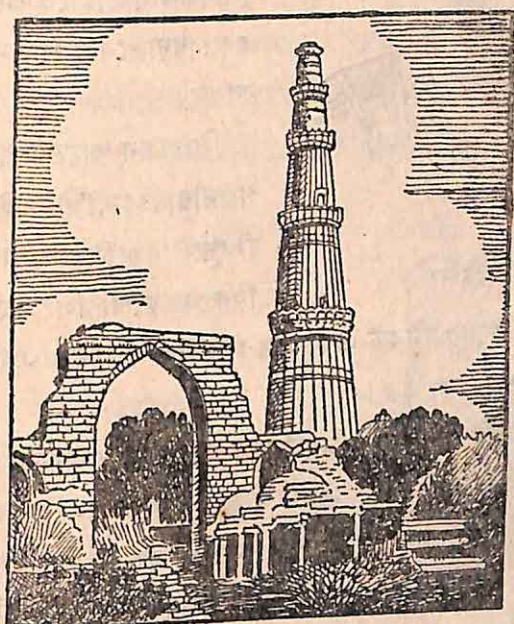
কুতব-মিনার

তিনি শিল্প ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার আমলে দিল্লীর **কুতব-মিনারের** নির্মাণকার্য শুরু হয়। ১২১০ খ্রীষ্টাব্দে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতনের ফলে তিনি আকস্মিকভাবে নিহত হন।

ইলতুৎমিস ঃ কুতবউদ্দীনের পর দিল্লীর সুলতান হন আরম। তিনি অযোগ্য শাসক ছিলেন, সেই কারণে প্রভাবশালী আমীর-

ওমরাহগণ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া কুতবউদ্দীনের জামাতা ইলতুৎমিসকে দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ইলতুৎমিস

জীবনী

ইলতুৎমিসও কুতবউদ্দীনের ন্যায় প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি নিজ গুণে কুতবউদ্দীনের আস্থা অর্জন করিতে সক্ষম হন। কুতবউদ্দীন তাঁহাকে কন্যাদান করেন এবং বদাউনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

সিংহাসন লাভের পর ইলতুৎমিস গজনীর তাজউদ্দীন ইলজিদ এবং সিন্ধুর নাসিরউদ্দীন কাবাচার বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে তরাইনের নিকট এক যুদ্ধে ইলজিদ পরাজিত এবং বন্দী হন, তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

প্রতিদ্বন্দ্বীদের পতন

১২১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইলতুৎমিস সিন্ধুর কাবাচার রাজ্য আক্রমণ করিলে কাবাচা নতি স্বীকার করেন। দশ বৎসর পরে উভয়ের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ বাধে, যুদ্ধে ব্যর্থ হইয়া নৌকাযোগে পলায়নের সময়ে কাবাচা নৌকাডুবির ফলে নিহত হন।

চেঙ্গিজখাঁর আক্রমণ

ইলতুৎমিসের শাসনকালে মধ্য-এশিয়ার দুর্ধর্ষ মোঘল নেতা **চেঙ্গিজ খাঁ** ভারতে আগমন করেন, ভারত আক্রমণ করিবার তাঁহার কোন উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু তিনি তাঁহার শত্রু খোয়ারিজমের শাসক জালালউদ্দীনের পশ্চাদনুসরণ করিয়া ভারতে প্রবেশ করেন। জালালউদ্দীন ইলতুৎমিসের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন, ইলতুৎমিস অসম্মত হন। জালালউদ্দীন ভারত ত্যাগ করিলে মোঙ্গলগণও ভারত ত্যাগ করেন। ইলতুৎমিসের বিচক্ষণতায় সুলতানী শাসন রক্ষা পায়।

ইলতুৎমিস বাংলার বিদ্রোহ দমন করেন এবং গোয়ালিয়র পুনর্দখল করেন। তাঁহার সেনাবাহিনী মালব, উজ্জয়িনী এবং ভিলওসা আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে।

বাগদাদের খালিফা ইলতুৎমিসকে একটি পরিচ্ছদ ও উপাধি প্রদান করিয়া ইলতুৎমিসের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করেন।

ইলতুৎমিস মুসলমান অধিকারের প্রসার ঘটাইতে সক্ষম হন। তিনি সুশাসন প্রবর্তন করেন। তিনি ছিলেন বিদ্যোৎসাহী এবং শিল্পের পৃষ্ঠপোষক। তাঁহার আমলে কুতবমিনারের নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হয় এবং আজমীরে একটি মসজিদ নির্মিত হয়।

রজিয়া ঃ ইলতুৎমিসের উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন তাঁহার কন্যা রজিয়া। ইলতুৎমিস রজিয়াকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেও তাঁহার মৃত্যুর পর আমীর-ওমরাহগণ রজিয়ার পরিবর্তে ইলতুৎমিসের এক পুত্র রুকনউদ্দীনকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে। কিন্তু রুকনউদ্দীনের অযোগ্যতায় বিরক্ত হইয়া আমীর-ওমরাহগণ শেষ পর্যন্ত রজিয়াকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে। রজিয়া ব্যতীত অপর কোন নারী দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই।

রজিয়া

রজিয়া শাসনকার্যে পারদর্শিনী ছিলেন। তিনি পুরুষের পোশাক পরিধান করিয়া দরবারের কার্য এবং যুদ্ধ পরিচালনা করিতেন। তাঁহার শাসনকার্যে অতিমাত্রায় আগ্রহ প্রদর্শনের জন্য এবং পুরুষোচিত গুণাবলীর জন্য আমীর-ওমরাহগণ অসন্তুষ্ট হন।

তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহীদের অন্যতম নায়ক ভাটিণ্ডার শাসনকর্তা অলতুনিয়ার হস্তে রজিয়া বন্দিনী হন। তিনি সিংহাসনচ্যুতও হন। রজিয়া অলতুনিয়াকে বিবাহ করিয়া শক্তি সঞ্চয় করেন। কিন্তু তিনি এবং অলতুনিয়া উভয়েই নিহত হন।

রজিয়ার পতন

নাসিরউদ্দীন

নাসিরউদ্দীনঃ রাজিয়ার মৃত্যুর পর দুইজন অযোগ্য ব্যক্তি সুলতান হন। অবশেষে ১২৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইলতুৎমিসের কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরউদ্দীন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ছিলেন বিদ্বান্ ও সচ্চরিত্র। তাঁহার ন্যায় ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু ও ধার্মিক ব্যক্তির পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করা কষ্টসাধ্য ছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তিনি বলবনের ন্যায় একজন সুদক্ষ এবং বিশ্বাসী মন্ত্রীর সাহায্য লাভ করেন।

চরিত্র

গিয়াসউদ্দীন বলবনঃ গিয়াসউদ্দীন বলবনও প্রথম জীবনে ইলতুৎমিসের ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি তাঁহার কর্মদক্ষতায় ইলতুৎমিস ও নাসিরউদ্দীনের বিশ্বাস অর্জন করেন। তিনি দীর্ঘ কুড়ি বৎসরকাল নাসিরউদ্দীনের মন্ত্রীরূপে শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

বলবন

নাসিরউদ্দীনের মৃত্যুর পর গিয়াসউদ্দীন বলবন সুলতান হন। তিনি কঠোর শাসক ছিলেন। বলবন কঠোর হস্তে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দমন করিয়া রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখেন। তিনি বাংলার তুঘ্রিল খাঁর বিদ্রোহ এবং মেওয়াটি দস্যুদের দমন করেন। বলবন মোঙ্গল আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তাঁহার প্রিয়তম পুত্র মহম্মদের মৃত্যু হইলে বলবন বৃদ্ধবয়সে শোকে প্রাণত্যাগ করেন।

কঠোর শাসন

বলবন ভারতে তুর্কী শাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। তিনি বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রসিদ্ধ কবি আমীর খসরু এবং আমীর হাসান তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তাঁহার দরবারে বহু জ্ঞানী ব্যক্তির সমাবেশ ঘটে।

অবদান

গিয়াসউদ্দীন বলবন

কায়কোবাদ ঃ বলবনের মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র কায়কোবাদ মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে সুলতান হন। তিনি ছিলেন বিলাসী ও আমোদপ্রিয়। তাঁহার অযোগ্যতায় বিরক্ত হইয়া আমীর-ওমরাহগণ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিলে 'দাস বংশে'র শাসনের অবসানঘটে। বিদ্রোহীগণ জালালউদ্দীন ফিরোজকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে।

দাসবংশের অবসান

খলজী বংশীয় শাসন, জালালউদ্দীন ফিরোজ ঃ খলজী বংশের প্রতিষ্ঠাতা জালালউদ্দীন বৃদ্ধ বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি কঠোর শাসক ছিলেন না। মোঙ্গলগণ এদেশ আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইলেও তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া এদেশে বসবাস করিবার অনুমতি দান করেন। মোঙ্গলগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর 'নব মুসলমান' নামে পরিচিত হয়।

জালালউদ্দীনের ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীন তাঁহার বিনা অনুমতিতে দক্ষিণ ভারতের দেবগিরি রাজ্য আক্রমণ করিয়া সাফল্যলাভ করেন এবং বহু ধন-রত্ন লইয়া প্রত্যাবর্তন করিলে বৃদ্ধ সুলতান আলাউদ্দীনকে অভিনন্দন জানাইতে যাইয়া আলাউদ্দীন কর্তৃক নিহত হন।

জালালউদ্দীনকে হত্যা

আলাউদ্দীন ঃ জালালউদ্দীনের পর আলাউদ্দীন সুলতান হন। তিনি ছিলেন দিল্লীর সুলতানগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সুলতান হইয়াই তিনি রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করেন। সুলতান হইবার পূর্বেই কোরার শাসনকর্তা থাকা কালে তিনি দেবগিরির রাজাকে পরাজিত করিয়া দক্ষিণ ভারতে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তি রচনা করেন।

আলাউদ্দীন

বিদ্রোহ দমন

তিনি কয়েকটি বিদ্রোহ এবং 'নব মুসলমান'দের এক ষড়যন্ত্র কঠোর হস্তে দমন করেন। তাঁহার আদেশে বহু 'নব মুসলমান'কে হত্যা করা হয়।

সুলতান হইয়া তিনি সর্বপ্রথম গুজরাট আক্রমণ করেন। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া প্রচুর ধন-রত্ন লাভ করেন। গুজরাটের রাজা কর্ণদেবের রানী কমলা দেবী বন্দিনী হন। অসংখ্য বন্দীদের মধ্যে মালিক কাফুরও ছিলেন। কাফুর পরবর্তী কালে আলাউদ্দীনের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন এবং দক্ষিণ ভারতে মুসলমান আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

গুজরাটের পর আলাউদ্দীন রাজপুতানার প্রতি দৃষ্টিদান করেন। প্রবল বাধার পর তাঁহার সৈন্যবাহিনী দুর্ভেদ্য রন্থম্ভোর অধিকার করে।

রাজ্য বিস্তার

রন্থম্ভোরের পর তিনি মেবার রাজ্যের রাজধানী চিতোর জয় করেন। অতঃপর মাণ্ডু, উজ্জয়িনী, ধার, চন্দেরী বিজিত হয়।

উত্তর ভারত বিজয়ের পর আলাউদ্দীন দক্ষিণ ভারত জয়ে মনোনিবেশ করেন। ১৩০৬ খ্রীষ্টাব্দে মালিক কাফুর দেবগিরি রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। দেবগিরির রাজা রামচন্দ্র বশ্যতা স্বীকার করিয়া দিল্লীর সামন্তরূপে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন।

অতঃপর বরঙ্গলের রাজা প্রতাপরুদ্রদেব কাফুরের নিকট পরাজিত হইয়া কর দানে সম্মত হন। ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে কাফুর হোয়সলরাজ তৃতীয় বীর বল্লালকে পরাজিত করেন। অতঃপর কাফুর পাণ্ড্য রাজ্য জয় করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত অগ্রসর হন।

দক্ষিণ ভারত জয়

১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে কাফুর পুনরায় দেবগিরি আক্রমণ করেন এবং দাভল, চৌল প্রভৃতি জয় করেন।

সাম্রাজ্যে যাহাতে বিদ্রোহ ঘটিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে আলাউদ্দীন কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি অসংখ্য গুপ্তচর নিয়োগ করেন।

আলাউদ্দীন একটি স্থায়ী সৈন্যদল গঠন করেন। সৈন্যদের স্বল্প বেতনে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য তিনি বাজারের জিনিসপত্রের দর বাঁধিয়া দেন।

শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ

তিনি মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থাও গ্রহণ করেন।

আলাউদ্দীন কেবল যোদ্ধাই ছিলেন না, তিনি শিল্প ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। প্রসিদ্ধ কবি আমীর খসরু আলাউদ্দীনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। ১৩১৬ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীনের মৃত্যু হয়।

কৃতিত্ব

আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর কাফুর আলাউদ্দীনের এক শিশুপুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজ্যের সর্বেসর্বা হইয়া উঠেন। আলাউদ্দীনের এক পুত্র কুতবউদ্দীন মোবারক কাফুরকে হত্যা করিয়া স্থলতান হন। কিন্তু তাঁহার প্রিয়পাত্র খসরু তাঁহাকে হত্যা করিয়া স্থলতান হইলে গাজী মালিকের নেতৃত্বে ওমরাহগণ বিদ্রোহী হইয়া খসরুকে হত্যা করেন। গাজী মালিক গিয়াসউদ্দীন তুঘলক নাম ধারণ করিয়া স্থলতান হইলে তুঘলক বংশের শাসনের সূত্রপাত ঘটে।

খলজীবংশের পতন

তুঘলক বংশের শাসনের ইতিহাস

গিয়াসউদ্দীন তুঘলক ঃ তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসউদ্দীন তুঘলক স্থলতান হইয়া বিশৃঙ্খলা দমন করেন। তাঁহার পুত্র জৌনা খাঁ বরঙ্গল জয় করেন এবং উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। গিয়াসউদ্দীন স্বয়ং বাংলায় দিল্লীর অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিয়া এক দুর্ঘটনায় নিহত হন।

মহম্মদ বিন তুঘলক ঃ গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের পর জৌনা খাঁ মহম্মদ বিন তুঘলক নাম ধারণ করিয়া স্থলতান হন। তাঁহার চরিত্রে বিপরীত গুণাবলীর সমাবেশ ঘটে। তিনি তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গ অপেক্ষা চিন্তায় অনেক বেশী প্রগতিশীল ছিলেন। তাঁহার আমলে দিল্লীর স্থলতানী শাসন দুর্বল হইয়া পড়ে।

মহম্মদ বিন তুঘলক

কর-বৃদ্ধি

স্থলতান হইয়া মহম্মদ গঙ্গা-যমুনা দোয়াবে করবৃদ্ধি করেন। বর্ধিত হারে খাজনা প্রদান করিতে সক্ষম না হওয়ায় মহম্মদ প্রজাদের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন।

দৌলতাবাদ

মহম্মদ নববিজিত দাক্ষিণাত্যের দেবগিরি রাজ্যকে **দৌলতাবাদ** নামকরণ করিয়া সেখানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে পুনরায় দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়।

মহম্মদ বিন তুঘলকও পারস্যের ন্যায় নির্দেশক মুদ্রার প্রচলন করেন। রাজকোষ অর্থশূন্য হওয়ায় তিনি রৌপ্যমুদ্রার পরিবর্তে

সমমূল্যে তাম্রমুদ্রার প্রচলন করেন। কিন্তু ঐ মুদ্রা যাহাতে জাল না হয় সেই প্রকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া তিনি মারাত্মক ভুল করেন। ফলে দেশ জাল মুদ্রায় পূর্ণ হইয়া উঠে। বিদেশী বণিকগণ তাম্রমুদ্রা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় অচল হইয়া পড়ে। সুলতান নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া আসল ও নকল প্রতিটি মুদ্রা ক্রয় করিয়া তাম্রমুদ্রার প্রচলন বন্ধ করিয়া দেন।

তাম্রমুদ্রা

সুলতানের অন্যান্য পরিকল্পনার ন্যায় দিগ্বিজয়ের পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়। ১৩৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সেনাবাহিনী নগরকোট দুর্গ জয় করে। অতঃপর তিনি হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে কারাজল বা কারাচলে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। কারাচলের বিরুদ্ধে অভিযান সাফল্য লাভ না করিলেও তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধিলাভ করে। তিনি খোরাসন ও ইরাক জয়ের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন বাস্তবক্ষেত্রে তাহার রূপদান করা সম্ভব হয় নাই। এক বিশাল বাহিনীকে এক বৎসরের পূর্ণ বেতন দানের পর ঐ দিগ্বিজয়ের পরিকল্পনা সুলতান পরিত্যাগ করেন।

রাজ্যজয়ের পরিকল্পনা

মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বের শেষ ভাগে সুলতানী শাসনের পতন শুরু হইয়া যায়। সুলতানের বিভিন্ন পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় এবং রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়ে। সুলতান স্বয়ং অত্যাচারী হইয়া উঠেন। অতঃপর সাম্রাজের বিভিন্নপ্রান্তে বিদ্রোহ দেখা দেয়। দক্ষিণ ভারতের ম'বার বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া স্বাধীন হইয়া যায়। পূর্ববঙ্গও স্বাধীন হইয়া পড়ে। ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগরে হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসকগণ বিদ্রোহী হন। দেবগিরির বৈদেশিক আমীরগণ বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। বিদ্রোহ দমনের জন্য সুলতানকে রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ব্যস্ত থাকিতে হয়। বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকা কালে ১৩৫১ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ বিন তুঘলকের মৃত্যু হয়।

বিদ্রোহ

মহম্মদ বিন তুঘলকের চরিত্র ছিল বিস্ময়কর। পরস্পরবিরোধী গুণের সমাবেশ তাঁহার মধ্যে দেখা গিয়াছিল। তিনি একদিকে ছিলেন বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, বিনয়ী, ধার্মিক, ন্যায়পরায়ণ, ন্যায়, দর্শন,

বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী, আর অপর দিকে অত্যাচারী, প্রজাপীড়ক, রক্তপিপাসু, অস্থিরচিত্ত। অনেকে তাঁহাকে পাগলা রাজা বলিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার চিন্তাধারা তাঁহার যুগের চিন্তাধারা অপেক্ষা অধিক প্রগতিশীল ছিল। ইহা ব্যতীত তিনি

উলেমাদের প্রভাব হ্রাস করায় ধর্মান্ধ ব্যক্তিগণ তাহাকে ভিন্নরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। অবশ্য মুর জাতীয় পর্যটক ইব্‌ন বতুতা তাঁহার আমলে এদেশে কিছুকাল অবস্থান করেন। বতুতা তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে বিপরীতধর্মী গুণাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রায়ই দেখা যাইত যে দরবার হইতে কোন ব্যক্তি পুরস্কার লাভ করিতেছে আবার কেহ মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইতেছে।

চরিত্রে বিপরীত ধর্মের সমাবেশ ও তাহার প্রভাব

যাহা হউক মহম্মদের ব্যক্তিগত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তাঁহার রাজত্ব-কালের ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং তাঁহার ব্যর্থতার ফলে দিল্লীর স্থলতানীর পতন অনিবার্য হইয়া উঠে।

ফিরোজ তুঘলক ঃ মহম্মদ বিন তুঘলক অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পিতৃব্যের পুত্র ফিরোজ তুঘলককে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয়। মহম্মদের রাজত্বকালের শেষভাগে যে সকল বিশৃঙ্খলা এবং অরাজকতা দেখা দেয় তাহা দূর করিবার যোগ্যতা ফিরোজের ছিল না। ফিরোজ ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান। কিন্তু তিনি ছিলেন ধর্মান্ধ, ফলে হিন্দুগণ অনেক সময়ে নিগৃহীত হইতেন।

সিংহাসন লাভ

ফিরোজ বাংলায় দিল্লীর প্রভাবের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলার শাসক সামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ফিরোজ বাংলায় আগমন করিলে ইলিয়াস শাহ সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত না হইয়া 'একডালার' দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিছুকাল অবরোধ করিবার পর ফিরোজ বাংলাদেশ পরিত্যাগ করেন।

বাংলা অভিযান

ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সিকান্দার শাহের আমলে ফিরোজ পুনরায় বাংলার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। সিকান্দারও ইলিয়াস শাহের নীতি অনুসরণ করিয়া যুদ্ধ না করিয়া 'একডালার' দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফিরোজের বাংলায় আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা

ফিরোজ কর্তৃক বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার

ব্যর্থ হয়। সিকান্দারকে ফিরোজ স্বাধীন শাসকরূপে স্বীকার করেন। উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বের প্রতিষ্ঠা হয় ; এবং উভয়েই উভয়ের দরবারে উপঢৌকন প্রেরণ করেন।

ফিরোজ উড়িষ্যা আক্রমণ করেন এবং পুরী অধিকার করেন। ১৩৬১ খ্রীষ্টাব্দে নগরকোট বিজিত হয়, তিনি সিন্ধুদেশের বিরুদ্ধে যে অভিযান প্রেরণ করেন তাহা ব্যর্থ হয়। মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালের শেষভাগে যে সকল প্রদেশগুলি দিল্লীর হস্তচ্যুত হয়, ফিরোজ সেইগুলি পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হন নাই এবং সুলতানী শাসনের পতন রোধও করিতে ব্যর্থ হন।

অন্যান্য অভিযানসমূহ

ফিরোজ শাসন ব্যবস্থায় সংস্কার প্রবর্তন করেন। তিনি জায়গীর প্রথার পুনঃপ্রবর্তন করেন। ফলে কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতা বৃদ্ধি পায়, তিনি রাজস্বের ভার হ্রাস করেন। জিজিয়া করের পুনঃপ্রবর্তন করেন। মধ্যযুগে শাস্তি হিসাবে অঙ্গচ্ছেদ প্রভৃতি নানাপ্রকার নির্মম দৈহিক নিপীড়ন-মূলক প্রথার উচ্ছেদ করেন।

শাসন ব্যবস্থা

ফিরোজ তুঘলক বহু গঠনমূলক কার্যগ্রহণ করেন। তিনি বহু নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাদের মধ্যে ফিরোজাবাদ, জৌনপুর, ফতেহাবাদ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য তিনি কয়েকটি খাল খনন করাইয়াছিলেন।

কৃতিত্ব

ফিরোজ তুঘলক বিদ্যার এবং বিদ্বান ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি বহু মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বরণী তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। ফিরোজ প্রায়ই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী পণ্ডিতগণের একত্র সমাবেশে উপস্থিত থাকিতেন।

ফিরোজের উত্তরাধিকারীবর্গের আমল :—ফিরোজ তুঘলকের বংশধরগণ সকলেই অযোগ্য শাসক ছিলেন। তাঁহাদের

অযোগ্যতার জন্য দিল্লীর সুলতানীর পতন আসন্ন হইয়া উঠে। তুঘলক বংশের শেষ শাসক ছিলেন মহম্মদশাহ। তাঁহার রাজত্বকালে দিল্লীর সুলতানীর উপর প্রচণ্ড আঘাত হানেন তৈমুরলঙ্গ।

তৈমুরের আক্রমণ

তৈমুর ছিলেন মধ্য এশিয়ার সমরখন্দের অধিবাসী, তুর্কী জাতির চাগ্‌তাই শাখার নায়ক। তৈমুর আফগানিস্তান, পারস্য ও ইরাক জয় করিবার পর ভারতে আগমন করেন। তাঁহার আগমনে ভীত হইয়া মহম্মদ গুজরাটে পলায়ন করেন। তৈমুর পাঞ্জাব ও দিল্লী অধিকার করিয়া দিল্লী লুণ্ঠন করেন।

তুঘলক বংশের অবসান

তাঁহার আদেশে পাঁচদিন ব্যাপী অবাধে হত্যাকাণ্ড চলিতে থাকে, অসংখ্য লোক নিহত হয়। দিল্লী শ্মশানে পরিণত হয়। তৈমুর ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার পূর্বে খিজির খাঁকে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া যান। তৈমুরের এদেশ ত্যাগের পর মহম্মদশাহ দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তুঘলক বংশের শাসনের অবসান ঘটে।

সৈয়দ বংশ

খিজির খাঁ ঃ তুঘলক বংশের শাসনের অবসানের পর তৈমুরের প্রতিনিধি পাঞ্জাবের শাসনকর্তা খিজির খাঁ দিল্লী অধিকার করেন। তিনি ছিলেন হজরত মহম্মদের বংশধর—সেই কারণে তাঁহার বংশধরগণ সৈয়দ বংশীয় নামে পরিচিত ছিলেন। খিজির খাঁর পর যথাক্রমে মোবারক, মহম্মদশাহ এবং আলাউদ্দীন আলমশাহ সুলতান হন। আলমশাহের আমলে বহলুল লোদী দিল্লী অধিকার করেন।

লোদী বংশ

বহলুল লোদী ঃ লোদীবংশের প্রতিষ্ঠাতা বহলুল লোদী ছিলেন জাতিতে আফগান। তিনি তুর্কীদের শত্রুতার সম্বন্ধে সচেতন

ছিলেন। তিনি আফগানদের সমর্থন লাভের জন্য আগ্রহী ছিলেন। তিনি সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন এবং বাহুবলে জৌনপুর, কালপি, গোয়ালিয়র প্রভৃতি অধিকার করেন। তিনি মেওয়াট এবং দোয়াবে বিদ্রোহ দমন করেন। তাঁহার আমলে দিল্লীর লুপ্তগৌরব কিয়ৎ-পরিমাণে পুনরুদ্ধার হয়।

সিকান্দার লোদী ঃ বহলুল লোদীর পর সিকান্দার লোদী সুলতান হন। তিনি তাঁহার পিতা কর্তৃক বিতাড়িত জৌনপুরের ভূতপূর্ব শাসক হোসেনশাহ শর্কীকে পরাজিত করেন। হোসেনশাহ শর্কী জৌনপুর পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করার ফলে সিকান্দারের নিকট পরাজিত হন। সিকান্দার বিহার অধিকার করেন। তাঁহার সহিত বাংলার সুলতান হোসেনশাহ চুক্তিবদ্ধ হন।

সিকান্দারের প্রচেষ্টায় দিল্লীর মর্যাদার আংশিক পুনরুদ্ধার ঘটে। তাঁহার আমলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়। দেশে সুশাসন বজায় ছিল।

সিকান্দার লোদী গঠনকারী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি আগ্রা শহরের পত্তন করেন।

সিকান্দার ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন। অবশ্য তিনি হিন্দুদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতেন। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইব্রাহিম লোদী ঃ সিকান্দার লোদীর পর তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম লোদী সুলতান হন। তিনি ছিলেন দিল্লীর শেষ সুলতান। ইব্রাহিম লোদী গোয়ালিয়রের রাজাকে নতি স্বীকারে বাধ্য করেন এবং মেবারের রানা সংগ্রামসিংহের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন।

কিন্তু ইব্রাহিম লোদী চতুর ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি ছিলেন উদ্ধত প্রকৃতির, তিনি প্রভাবশালী এবং সম্ভ্রান্ত আফগানদিগের ক্ষমতা খর্ব করিতে যাইয়া তাহাদের বিরাগভাজন হন। অসন্তুষ্ট আফগানদের অন্যতম নায়ক পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদী

কাবুলের অধিপতি বাবরকে ইব্রাহিম লোদীকে আক্রমণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। বাবর ঐ আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের নিকট ইব্রাহিম লোদী পরাজিত এবং নিহত হন। দিল্লীর স্থলতানী শাসনের অবসান ঘটিয়া ভারতে মুঘল শাসনের সূচনা হয়।

স্থলতানী শাসনের অবসান

অনুশীলনী

১। গজনীর স্থলতান মামুদের ভারত আক্রমণ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

২। মহম্মদ ঘোরীর প্রচেষ্টায় ভারতে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাহিনী লিখ।

৩। দিল্লীর স্থলতানীর প্রথম বংশকে 'দাসবংশ' বলা হয় কেন?

৪। ইলতুৎমিসের রাজত্বকাল সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৫। রজিয়ার সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৬। গিয়াসউদ্দীন বলবন সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৭। শাসক এবং দিগ্বিজয়ীরূপে আলাউদ্দীন খলজীর আলোচনা কর।

৮। মহম্মদ বিন তুঘলককে পাগলা রাজা বলা হয় কেন?

৯। ফিরোজ তুঘলক সম্বন্ধে আলোচনা কর।

১০। লোদী বংশীয় স্থলতানদের সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

১১। **টীকা লিখ:**

(ক) নাসিরউদ্দীন, (খ) তৈমুরলঙ্গ, (গ) পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ।

মৌখিক প্রশ্ন:

(ক) 'দাসবংশের' প্রথম স্থলতান কে ছিলেন?

(খ) চেঙ্গিস খাঁ কে? কাহার আমলে চেঙ্গিস খাঁ ভারতে প্রবেশ করেন।

(গ) দিল্লীর সিংহাসনে যে একমাত্র নারী অধিষ্ঠিতা ছিলেন তাঁহার নাম কি?

(ঘ) দাক্ষিণাত্যে সর্বপ্রথম মুসলমান অধিকারের প্রতিষ্ঠা কে করেন?

(ঙ) পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে কে জয়লাভ করেন?

———

সপ্তম অধ্যায়

বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্য

বিজয়নগর ঃ দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। কোন
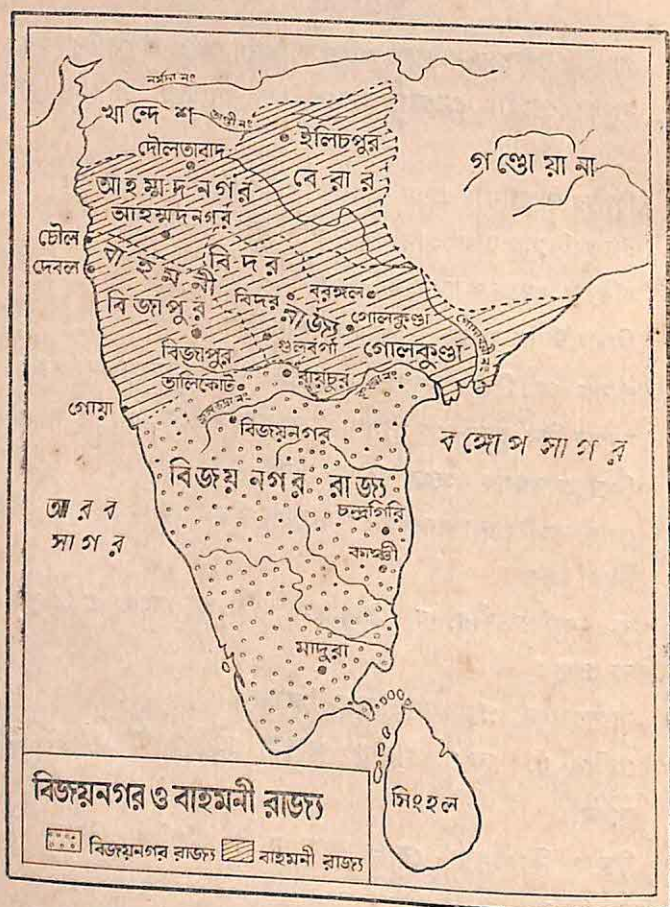
কোন ঐতিহাসিকের মতে মালিক কাফুরের আক্রমণের সময়ে হোয়সলরাজ তৃতীয় বীরবল্লাল তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণে আনুগুণ্ডি নামে

যে দুর্গটি নির্মাণ করেন, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া রাজ্যটি গড়িয়া উঠে। আবার কাহারও মতে মহম্মদ জুনা খাঁ বরঙ্গল আক্রমণ করিলে সঙ্গমের পাঁচ পুত্র বরঙ্গল ত্যাগ করিয়া এই নূতন রাজ্যটির প্রতিষ্ঠা করেন।

উৎপত্তি

একের পর এক বিজয়নগর নামে হিন্দু রাজ্যটিতে সঙ্গম, শালুব, তুলুব এবং আরবীডু নামক বিভিন্ন বংশ শাসন করে।

বিজয়নগরে সর্বপ্রথম **সঙ্গম** বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। হরিহর, বুক্ক প্রভৃতি সঙ্গমের পুত্রগণ উত্তরে তুঙ্গভদ্রা হইতে দক্ষিণে সম্ভবতঃ ত্রিচিনাপল্লী পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেন।

সঙ্গম বংশ

বেদের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার সায়ন এবং মাধব বুক্কের রাজসভা অলংকৃত করিতেন। বুক্ক চীন দেশে দূত প্রেরণ করেন।

বুক্কের পুত্র দ্বিতীয় হরিহরের আমলে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী রায়চুর দোয়াবকে কেন্দ্র করিয়া প্রতিবেশী বাহমনী রাজ্যের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষ বাধে। হরিহর যুদ্ধে পরাজিত হন। বাহমনী রাজ্যের সহিত যুদ্ধে প্রথম ও দ্বিতীয় দেবরায় উভয়েই পরাজিত হন, যদিও শক্তি বৃদ্ধির জন্য দ্বিতীয় দেবরায় সৈন্যদলে মুসলমান অশ্বারোহী এবং তীরন্দাজ নিয়োগ করেন। তিনি শাসন ব্যবস্থায় সংস্কার প্রবর্তন করেন এবং সমুদ্রবক্ষে বাণিজ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সঙ্গম বংশের দুর্বলতা দেখা দিলে ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে নরসিংহ বিজয়নগরে সঙ্গম বংশের পরিবর্তে **শালুব** বংশের শাসনের সূচনা করেন। ঐ সময়ে বাহমনী রাজ্য পাঁচটি রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং ঐ সকল রাজ্যের শাসকগণের সহিত বিজয়নগরের সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে সেনাপতি নরস নায়কের পুত্র বীর নরসিংহ শালুব বংশের পরিবর্তে **তুলুব** বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

শালুব বংশ

তুলুব বংশীয় **কৃষ্ণদেব রায়** ছিলেন বিজয়নগর রাজ্যের শাসকগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি রায়চুর দোয়াব অধিকার করেন।

তাঁহার নিকট বিজাপুরের সুলতান পরাজিত হন। কৃষ্ণদেব রায় গোলকুণ্ডার দুর্গটি বিধ্বস্ত করেন। তিনি উড়িষ্যার কিয়দংশে আধিপত্য বিস্তার করেন।

তুলুব বংশ

তিনি সম্ভবতঃ পশ্চিমে কোঙ্কন, পূর্বে ওয়ালটেয়ার এবং দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেন। ভারত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপও তাঁহার শাসনাধীন ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। তাঁহার আমলে শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম প্রভৃতি সকল বিষয়ে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়। বিজয়নগরের খ্যাতি সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে।

বিজয়নগরের চরম উন্নতি

কৃষ্ণদেব রায়

তুলুব বংশীয় রাজা সদাশিব রায়ের আমলে মন্ত্রী রামরাজা (রাম রায়) রাজ্যের প্রকৃত শাসক ছিলেন। তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সহযোগে আহম্মদনগর বিধ্বস্ত করেন। অতঃপর তাঁহার ঔদ্ধত্যের ফলে বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহম্মদনগর ও বিদরের সেনাবাহিনী একযোগে বিজয়নগর আক্রমণ করে। তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগরের সেনাবাহিনী পরাজিত হয়। রামরাজা বন্দী এবং নিহত হন। বিজয়নগর শহর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। দক্ষিণ ভারতে হিন্দু আধিপত্য দীর্ঘকালের জন্য বিলুপ্ত হয়।

তালিকোটার যুদ্ধ

তালিকোটার যুদ্ধের পর রামরাজার ভ্রাতা তিরুমল রাজা হন। ফলে **আরবীডু** বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বিজয়নগর রাজ্যের পতন রোধ করা আরবীডু বংশীয় শাসকগণের পক্ষে সম্ভব হইল না।

বিজয়নগরের পতন

ইটালীয় নিকোলো কন্তি, পর্তুগীজ পাএস এবং বারবোসা আরব পর্যটক আবদুর রজ্জাক প্রভৃতি বিজয়নগর রাজ্যের সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। তাঁহাদের রচনা হইতে বিজয়নগরের সমৃদ্ধি, কৃষ্টি, সংস্কৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য জানা যায়।

বৈদেশিকগণের বিবরণ

বিজয়নগরে উন্নত শাসনব্যবস্থা বজায় ছিল। রাজা ছিলেন শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে। তিনি মন্ত্রিগণ এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারিগণের সহায়তায় রাজ্য শাসন করিতেন। রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রাদেশিক শাসকগণকে নায়ক বলা হইত। গ্রাম ছিল স্থানীয় শাসনের ক্ষুদ্রতম অংশ। গ্রামসভা গ্রামের শাসনকার্য পরিচালনা করিত।

ভূমি রাজস্বই ছিল রাজ্যের প্রধান আয়ের উৎস। ইহা ব্যতীত অন্যান্য করও ছিল।

শাসন ব্যবস্থা

বিচার ব্যবস্থাও উন্নত ছিল। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে দণ্ডাদেশ দেওয়া হইত।

সামরিক বাহিনীতে নিয়ম ও শৃঙ্খলার কিঞ্চিৎ অভাব ছিল।

বিজয়নগরের কৃষি এবং শিল্প উন্নত ছিল। বাণিজ্যও উন্নত ছিল। ব্রহ্মদেশ, মালয়, চীন, পারস্য, পর্তুগাল প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য চলিত।

বাণিজ্য

বিজয়নগর হিন্দুধর্মের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। এই রাজ্যের শাসকগণ দক্ষিণ ভারতের মুসলমানগণের সহিত হিন্দুধর্মের রক্ষাকর্তা বহুকাল সংগ্রাম করেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন।

সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করেন সায়ন, মাধব প্রভৃতি। কৃষ্ণদেব রায় স্বয়ং সংস্কৃত এবং তেলেগু ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন। তামিল, তেলেগু প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষারও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

কৃতিত্ব

বহু মন্দির নির্মিত হয়, ঐগুলি শিল্পের উন্নতির পরিচায়ক। চিত্র শিল্পেরও উন্নতি হয়।

বাহমনী রাজ্য ঃ মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালের শেষ-ভাগে দেবগিরির বৈদেশিক আমীরগণ বিদ্রোহী হন, তাঁহাদের অন্যতম নেতা হাসান বাহমনী নামে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। হাসান নিজেকে পারস্যের বিখ্যাত বীর বাহমনের বংশধর বলিয়া পরিচয় দান করিতেন সেই কারণে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজ্য বাহমনী নামে পরিচিত। অনেকে মনে করেন যে হাসান গঙ্গু নামক জনৈক ব্রাহ্মণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য রাজ্যের বাহমনী নাম রাখেন—কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য নহে।

উৎপত্তি

ফিরোজ তুঘলক দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহী না হওয়ায় হাসান গোয়া, দাভোল, কোহ্লাপুর, তেলেঙ্গানা জয় করেন। তাঁহার মালব ও গুজরাটের বিরুদ্ধে অভিযান ব্যর্থ হয়।

ক্ষমতা বৃদ্ধি

হাসানের পুত্র প্রথম মহম্মদ শাহ বিজয়নগরের রাজা প্রথম বুক্ককে পরাজিত করেন।

ঐ সময় হইতেই বিজয়নগর-বাহমনী সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। তিনি গোলকুণ্ডা দখল করেন। পরবর্তী সুলতান বিজয়নগরের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই।

বাহমনী বংশের শাসকগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন ফিরোজ শাহ। তিনি দুইবার বিজয়নগরের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন, কিন্তু তৃতীয়বারে স্বয়ং পরাজিত হন। বাহমনী রাজ্যের কিয়দংশ বিজয়নগরের অধীনে চলিয়া যায়।

ফিরোজ সুশাসক ছিলেন। তিনি শিল্পেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাহমনী রাজ্যের রাজধানী গুলবর্গায় তিনি বহু সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করেন।

পরবর্তী সুলতান আহম্মদ শাহের আমলে বিদরে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়। তিনি বরঙ্গল রাজ্যের বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ করেন। তিনি বিজয়নগরের শক্তি খর্ব করেন।

বাহমনী-বিজয়নগর সংঘর্ষ

বাহমনী সুলতান আলাউদ্দীনের আমলেও বিজয়নগরের সহিত সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। বিজয়নগররাজ দ্বিতীয় দেবরায় নিয়মিত ভাবে কর দান করিতে সম্মত হন।

বাহমনী রাজ্যের দুর্বলতা

কালক্রমে বাহমনী রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ে। দেশীয় এবং বৈদেশিক মুসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, সিয়া ও সুন্নীর দ্বন্দ্ব প্রভৃতিই ছিল বাহমনী রাজ্যের দুর্বলতার কারণ। কিন্তু বাহমনী রাজ্যের দুঃসময়ে একজন সুদক্ষ ব্যক্তি সুলতানের অধীনে দীর্ঘকাল মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বাহমনী রাজ্যের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। ঐ ব্যক্তির নাম **মামুদ গাওয়ান**। তিনি গোয়া এবং কোঙ্কনে আধিপত্য বিস্তার করেন। উড়িষ্যা এবং তেলেঙ্গানার বিরুদ্ধে যে অভিযান প্রেরণ করেন তাহা সফল হয়। তাঁহার প্রেরিত সেনাবাহিনী কাঞ্চী নগরকে বিধ্বস্ত করে।

মামুদ গাওয়ান

মামুদ গাওয়ান সুদক্ষ শাসক ছিলেন। কিন্তু গাওয়ান ছিলেন বিদেশী। স্থানীয় আমীরগণ তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তিতে ঈর্ষা বোধ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। নির্বোধ সুলতান তৃতীয় মহম্মদ শাহ গাওয়ানের প্রাণদণ্ডাদেশ দান করেন। ফলে বাহমনী রাজ্যের পতনও অনিবার্য হইয়া পড়ে।

বাহমনী রাজ্যের পতন

তৃতীয় মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর নাবালক মামুদ শাহের আমলে বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহম্মদ নগর ও বেরারের প্রাদেশিক শাসকগণ স্বাধীন হইয়া পড়েন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে আমীর বারিদ বিদর অধিকার করিলে বাহমনী শাসনের অবসান ঘটে। কারণ ঐ সময়ে বাহমনী শাসন কেবলমাত্র বিদরে সীমাবদ্ধ ছিল। বাহমনী রাজ্য হইতে পাঁচটি রাজ্যের উৎপত্তি হয়, মোঘল শাসনকালে তাহাদের স্বাধীন অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটে।

রুশ পর্যটক নিকিতিন পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে বাহমনী রাজ্যে আগমন করেন। তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায় যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের অবস্থা উন্নত থাকিলেও জনসাধারণকে দুঃখ-কষ্টে কাল অতিবাহিত করিতে হইত।

নিকিতিন

বাহমনী রাজ্যের মোট ১৪ জন সুলতানদের মধ্যে অনেকেই নিষ্ঠুর ছিলেন, অবশ্য কয়েকজন শিল্প, স্থাপত্য, শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। গুলবর্গা ও বিদরে বাহমনী সুলতানগণের শিল্প-প্রীতির কিছু কিছু নিদর্শন রহিয়াছে।

উপসংহার

অনুশীলনী

১। বিজয়নগর রাজ্যের ইতিহাস লিখ।

২। বিজয়নগর রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক কে ছিলেন? তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৩। বাহমনী রাজ্য সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৪। টীকা লিখ: (ক) কৃষ্ণদেব রায় (খ) তালিকোটার যুদ্ধ।

মৌখিক প্রশ্ন:

(ক) বিজয়নগরের প্রথম রাজবংশের নাম উল্লেখ কর।

(খ) রামরাজা কোন্ যুদ্ধে নিহত হন?

(গ) কোন্ কোন্ বিদেশী পর্যটক বিজয়নগর এবং বাহমনী রাজ্যে আগমন করেন?

অষ্টম অধ্যায়

ধর্ম ও সমাজ সংস্কারকগণ

মধ্যযুগে হিন্দু সংস্কৃতি সর্বপ্রথম ঐস্লামিক সংস্কৃতির সংস্পর্শ লাভ করে। মুসলমান শাসকগণের আমলে ইসলাম ধর্মের প্রচারের ফলে যে সকল হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামি হইতে মুক্ত ছিলেন না সেই সকল হিন্দুদের মধ্যে ধর্মান্ধতা ও জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অপরদিকে হিন্দু সমাজের এক বৃহৎ অংশ ইসলাম ধর্মে প্রাচীন ভারতের একেশ্বরবাদ এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের আদর্শ লক্ষ্য করিয়া ইসলামের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন।

মধ্যযুগে কয়েকজন ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারকের আবির্ভাব হয়, তাঁহারা সকলেই ধর্মের গোঁড়ামি হইতে সমাজকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা সেই জাতিভেদকে স্বীকার করিতেন না, ধর্ম ও বর্ণের কোন ভেদ তাঁহাদের নিকট ছিল না।

ভক্তিবাদ

ঐ সকল ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারকগণের মতে সকল ধর্ম সমান, ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, ঈশ্বরকে ভক্তি ও প্রেমের মাধ্যমে এবং ঈশ্বর যে মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন সেই মানবকে প্রেমের মাধ্যমে মুক্তিলাভ সম্ভব। ঐ মতবাদ ভক্তিবাদ নামে পরিচিত।

সুফীবাদ

মুসলমান ধর্ম-সংস্কারকগণের মধ্যে কয়েকজন অনুরূপ ধর্মমত প্রচার করেন—মুসলমান ধর্ম-সংস্কারকগণের ঐ মতবাদ সুফীবাদ নামে পরিচিত। ভক্তিবাদ ও সুফীবাদের প্রচারকগণের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানদের কোন প্রভেদ ছিল না। উভয় মতই হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিকট গ্রহণ-যোগ্য ছিল, ফলে ধর্মের ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। ভক্তিবাদের প্রচারকগণের মধ্যে

রামানন্দ, কবীর, চৈতন্য, নানক ও রামদাস সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হইল—

রামানন্দ ঃ যে সকল ধর্মপ্রচারক ভক্তিবাদের প্রচার করেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম রামানন্দের নাম উল্লেখ করিতে হয়। তাঁহার জন্মস্থান সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। কাহারও মতে তিনি দাক্ষিণাত্যে জন্মগ্রহণ করেন, আবার কাহারও মতে এলাহাবাদে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। রামানন্দ বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধক রামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। রামানুজ ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মের শ্রীসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা স্বরূপ।

রামানন্দ রামসীতার উপাসক ছিলেন। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বহু ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। রামানন্দের নিকট জাতি-ধর্মের কোন প্রকার ভেদ ছিল না। রামানন্দের প্রচেষ্টায় উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ভক্তিবাদ আন্দোলনের মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। রামানন্দ সাধারণ লোকের সুবিধার জন্য সাধারণ হিন্দী ভাষায় ধর্ম-প্রচার করেন। তিনি বহু তীর্থস্থান পরিদর্শন করেন। ধর্মের সহিত জড়িত সকল প্রকার কুসংস্কারের উর্ধ্বে তিনি বিরাজ করিতেন। রামানন্দ ভগবৎ-প্রেমের ক্ষেত্রে উচ্চ-নীচের ভেদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করিতেন। তিনি জাতিভেদ প্রথাকেও স্বীকার করিতেন না। তাঁহার শিষ্যগণের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিলেন কবীর।

জাতিভেদকে অস্বীকার

কবীর ঃ রামানন্দের শিষ্যগণের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন কবীর। কবীর কাশীতে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে যে কবীর এক ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বিধবা মাতা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে নিরু নামক জনৈক মুসলমান তন্তুবায় তাঁহাকে লালন পালন করেন।

কবীর প্রথমে তন্তুবায়ের বৃত্তি গ্রহণ করেন। সংসারধর্ম অপেক্ষা ধর্মচর্চার প্রতি তাঁহার অন্তঃকরণ অধিক আকৃষ্ট হয়, হিন্দু দর্শন এবং সুফী সম্প্রদায়ের প্রভাব তাঁহার মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিলক্ষিত হয়।

জীবন

কবীরের দৃষ্টিতে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। তিনি সকলকে অতি অল্প বয়স হইতেই ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন হইতে এবং ঈশ্বরের ভজনা করিবার জন্য উপদেশ দিতেন।

কবীর প্রথমে কোন গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই, সেইজন্য অনেকে তাঁহাকে 'নিগুরা' নামে উপহাস করিতেন। কবীর অবশ্য পরে মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক রামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর কবীর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার মধ্যে হিন্দু দর্শন ও সুফীবাদের প্রভাব ছিল, কেবল তাহাই নহে ঐ সকল প্রভাবের সহিত তাঁহার নিজস্ব অন্তরের উপলব্ধি যুক্ত ছিল। তাঁহার জ্ঞান, নিষ্ঠা, ভক্তি, সদাচার এবং রামনাম কীর্তনের সহিত পরিচিত হইয়া হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বহু ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

কবীরের সাফল্য

কবীর

কবীর হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মের সমন্বয়ের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। প্রচলিত (ধর্মীয়) আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক রীতি-নীতি ও সংস্কারের বিরোধিতা করার ফলে তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্মান্ধ ব্যক্তিগণের শত্রুতে পরিণত হন।

ধর্মান্ধদের বিরোধিতা

কবীর সমাজের উচ্চশ্রেণী অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর জনগণকে অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হন।

কবীর বলিতেন 'পরমাত্মা এক'। রাম, রহিম, আল্লা ও হরির মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। কবীরের সহিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সদ্ভাব ছিল। তিনি তৎকালীন হিন্দী ভাষাভাষী সমাজে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেন।

ধর্মমত

সাহিত্যেও কবীরের উল্লেখযোগ্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার অনুসরণে উত্তর ভারতে সন্তকাব্য নামক এক বিশেষ শ্রেণীর কাব্য গড়িয়া উঠে।

সন্তকাব্য

কবীর জাতি ও সম্প্রদায়ের ভেদ স্বীকার করিতেন না, কিন্তু তাঁহার হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যগণের মধ্যে যথেষ্ট বিভেদ ছিল। তাঁহার হিন্দু শিষ্যগণের মধ্যে কালক্রমে জাতিভেদ দেখা দেয়। তাঁহার ব্রাহ্মণ শিষ্যগণ উপবীত ধারণ করিতেন। এমন কি তাঁহার নিম্নবর্ণের হিন্দু শিষ্যগণ অস্পৃশ্যরূপে পরিগণিত হইতেন।

ব্যর্থতা

নামদেব : নামদেব ছিলেন মধ্যযুগের ধর্মপ্রচারকগণের অন্যতম। মহারাষ্ট্রে তাঁহার জন্ম হয়। জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন নীচবংশীয়। তিনিও ভক্তিবাদের প্রচার করেন। তিনি ছিলেন পানধারপুরের বিঠোবার ভক্ত। তিনি একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করিতেন। ধর্মের সরল ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বহু নরনারীর অন্তঃকরণ জয় করেন। তিনি ধর্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠানকে স্বীকার করিতেন না। সুচিন্তা, ভক্তি ও ঈশ্বরের গুণকীর্তন ছিল তাঁহার ধর্মমতের মূলকথা। তিনিও হিন্দু ও মুসলমান —দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

শ্রীচৈতন্য

শ্রীচৈতন্য : ভক্তিবাদের প্রচারকগণের মধ্যে শ্রীচৈতন্য ছিলেন সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী নবদ্বীপে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ছিল জগন্নাথ মিশ্র এবং মাতার নাম শচীদেবী। শ্রীচৈতন্যের পূর্বপুরুষগণ শ্রীহট্টের অধিবাসী ছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে শ্রীচৈতন্যের নাম ছিল বিশ্বম্ভর। তাঁহার অপর নাম ছিল নিমাই, নিমাই নামেই তিনি অধিক পরিচিত ছিলেন।

জীবনী

শৈশবকাল হইতেই তিনি ছিলেন মেধাবী ও বিদ্যানুরাগী। অতি অল্প বয়স হইতেই তিনি অধ্যাপনা করিতে শুরু করেন।

শ্রীচৈতন্য অতি অল্প বয়স হইতেই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। তেইশ বৎসর বয়সে তাঁহার জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সূচনা হয়। ঐ সময়ে পিতার পিণ্ডদানের জন্য তিনি গয়া গমন করেন। গয়ায় বিষ্ণুপাদ মন্দিরে বিষ্ণুপাদ দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে ভাবান্তর ঘটে। অতঃপর তাঁহার হৃদয় হরিভক্তিতে আপ্লুত হইয়া পড়ে। গয়া হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করিয়া পরবর্তী এক বৎসর হরিনাম সংকীর্তনে মগ্ন হন। ঐ সময়ে বহু বন্ধু এবং ভক্ত তাঁহার সহিত যোগদান করেন। যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার ভক্তে পরিণত হন তাঁহাদের মধ্যে অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ, ধর্মান্তরিত (পূর্বে ইসলামধর্মাবলম্বী) হরিদাস ঠাকুর (যবন হরিদাস) এবং তাঁহার চরিত্র রচনাকারী ও প্রাক্তন সহপাঠী মুরারি গুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। এক বৎসর পরে, অর্থাৎ চব্বিশ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, বা শ্রীচৈতন্য অথবা চৈতন্যদেব নামে পরিচিত হন। অতঃপর তিনি নীলাচলে গমন করেন এবং ছয় বৎসর ধরিয়া নানা তীর্থক্ষেত্র পরিভ্রমণ করেন। তীর্থ ভ্রমণের পর দীর্ঘ আঠার বৎসর একাদিক্রমে তিনি নীলাচলে অবস্থান করেন। ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগস্ট মাত্র সাতচল্লিশ বৎসর বয়সে শ্রীচৈতন্য দেহত্যাগ করেন।

হৃদয়ে ভাবান্তর

সন্ন্যাস গ্রহণ

শ্রীচৈতন্যের প্রচেষ্টায় বাংলায় বৈষ্ণবধর্ম নূতনরূপ লাভ করে। বাংলায় বৈষ্ণবধর্ম নূতনরূপ লাভের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম নামে পরিচিত হয়। চৈতন্যদেবের নিকট শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন একমাত্র ঈশ্বর এবং আরাধ্য। চৈতন্যদেব বলিতেন ঈশ্বরকে লাভ করিতে হইলে প্রেমের দ্বারা সম্ভব।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম

চৈতন্যদেব কেবলমাত্র ধর্মীয় সংস্কারক ছিলেন না, তিনি সমাজ-সংস্কারকও ছিলেন। মধ্যযুগে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যে সকল

ভক্তিবাদে বিশ্বাসী ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটে তাঁহাদের ন্যায় চৈতন্যদেবও জাতিভেদ প্রথাকে স্বীকার করিতেন না। উচ্চ-নীচ-নির্বিশেষে তিনি সকলকে প্রেমের, ভক্তির বাণী শুনাইয়াছিলেন।

জাতিভেদ প্রথাকে অস্বীকার

চৈতন্যদেব যে কেবলমাত্র জাতিভেদ প্রথাকে অস্বীকার করিয়াছিলেন তাহাই নহে, তিনি ছিলেন সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে। হিন্দু-অহিন্দু কোনও বাছবিচার তিনি করিতেন না। হিন্দু-অহিন্দু উচ্চ-নীচ-নির্বিশেষে তিনি সকলের নিকট ভক্তি-বাদের প্রচার করেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে মুসলমানও ছিলেন। তিনি বলিতেন জাতি-বর্ণ-নির্বিচারে সকল মানুষই আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হইতে পারে।

সাম্প্রদায়িকতাকে অস্বীকার

চৈতন্যদেবের ধর্মীয় বাণী বাংলার ধর্মজগতে অভাবনীয় পরিবর্তন সাধন করিতে সক্ষম হয়।

নানক

নানক ঃ মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারক ছিলেন নানক। তিনি শিখধর্মের প্রবর্তক ছিলেন। ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের নিকট

তালওয়ান্দি নামক গ্রামে নানকের জন্ম হয়। নানক শৈশবকাল হইতেই নির্জনে সময় অতিবাহিত করিতে ভালবাসিতেন। তিনি শৈশবকাল হইতেই সাধুসঙ্গও পছন্দ করিতেন। অন্তরের তাগিদে এবং ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত তিনি বহু সাধু-সন্ন্যাসীর নিকট গমন করিতেন। ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে আগস্ট আকস্মিকভাবে নানকের অন্তরে এক গভীর আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ হয়।

জীবনী

নানক উপলব্ধি করেন যে ধর্মের ভেদাভেদ কৃত্রিম। তিনি বলিতেন সকল মানুষই ঈশ্বরের সন্তান, মানুষে মানুষে কোন প্রভেদ নাই, যে প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় তাহা নিতান্তই কৃত্রিম।

ধর্মমত

নানক অত্যন্ত সহজ এবং সরল ভাষায় ধর্মীয় শিক্ষাদান করিতেন। তিনি অন্ধ ধর্মবিশ্বাস এবং কুসংস্কারকে স্বীকার করিতেন না।

আধ্যাত্মিক চেতনালাভের পর নানক দীর্ঘ বাইশ বৎসর ধরিয়া মক্কা, মদিনা, বাগদাদ, দিল্লী, কুরুক্ষেত্র, বৃন্দাবন, কাশী, গয়া, কামরূপ ও সিংহল প্রভৃতি নানাস্থান পরিভ্রমণ করেন। ঐ সময়ে বহু ব্যক্তি নানকের ধর্মমতের প্রতি আকৃষ্ট হন। নানকের শিষ্যগণ নিজেদের 'শিখ' (শিষ্য) নামে অভিহিত করিতেন।

তীর্থভ্রমণ

'শিখ'

নানকের নিকট উচ্চ-নীচ, হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতির কোন প্রভেদ ছিল না। তিনি ছিলেন সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে। হিন্দু-মুসলমান, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বহু ব্যক্তি নানকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতাকে অস্বীকার

নানক তাঁহার শিষ্যদিগকে এক ঈশ্বর, গুরু এবং নাম জপের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিতেন। তিনি সহনশীলতার বাণী প্রচার করেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ধর্মগত এবং সমাজগত মিলনের জন্য প্রচেষ্টা করেন।

রামদাস ঃ মধ্যযুগের শেষভাগে মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে জাগরণ পরিলক্ষিত হয় তাহাতে একনাথ, তুকারাম এবং রামদাস স্বামী প্রভৃতি ধর্মীয় নেতাদের যথেষ্ট অবদান ছিল।

রামদাস ছিলেন সাধু তুকারামের সমসাময়িক। রামদাস ছিলেন মারাঠাসূর্য শিবাজীর গুরু। রামদাসের পিতার নাম সূর্যজীপন্ত্ এবং মাতার নাম রাণূবাঈ।

ধর্ম বিশ্বাস

রামদাস ছিলেন রামভক্ত এবং রামের বীরত্বের পূজারী। তিনি ক্ষত্রিয়ের বীরত্বে আস্থাশীল ছিলেন। তিনি রামচন্দ্রের নিকট সমর্পণের উপদেশ দান করিতেন।

'রামদাসী'

রামদাস গোদাবরী তীরে দীর্ঘ বার বৎসর রামনাম এবং কঠোর তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। অতঃপর তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত পরিভ্রমণ করেন। তিনি 'রামদাসী' পন্থার প্রবর্তন করেন। তিনি 'দাসবোধ' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে রামভক্ত হনুমানের মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন।

রামদাস রামায়ণের যুদ্ধখণ্ডের অনুবাদ করেন। তিনি উপদেশ-মূলক দুই শতাধিক কবিতা রচনা করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব

রামদাস কোন একটি অন্যায়ের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণেরও পক্ষপাতী ছিলেন। মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক জীবনেও তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। শিবাজীকে তিনি রাজাদর্শ সম্বন্ধে শিক্ষাদান করেন। শিবাজীর রাজাদর্শে রামদাসের উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়িয়াছিল।

শিবাজীর মৃত্যুর পর শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীকেও তিনি লিখিত-ভাবে বহু অমূল্য উপদেশ দান করেন। ঐ উপদেশগুলি এবং তাঁহার রচিত বহু কবিতা আজিও মহারাষ্ট্রে সমাদর লাভ করিতেছে।

অনুশীলনী

১। কবীর সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৩। গুরু নানক কে ছিলেন? তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৪। রামদাস সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৫। টীকা লিখ: (ক) রামানন্দ, (খ) নামদেব।

মৌখিক প্রশ্ন:

(ক) রামানন্দের গুরু কে ছিলেন?

(খ) চৈতন্যদেব কর্তৃক রূপান্তর লাভের পর বৈষ্ণবধর্ম বাংলা দেশে কি নামে পরিচিত ছিল?

(গ) 'শিখ' শব্দের অর্থ কি? শিখ ধর্মের প্রবর্তক কে ছিলেন?

(ঘ) রামদাস ও শিবাজীর মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল?

নবম অধ্যায়

মুঘল বংশীয় শাসন

'মোঙ্গল' শব্দটি 'মুঘল' (মোঘল বা মোগল) শব্দের অবিকৃত রূপ। মোঙ্গল শব্দটি হইতেই মুঘল শব্দটির উৎপত্তি হইয়াছে। মোঙ্গলগণের আদি বাসভূমি ছিল মোঙ্গোলিয়ায়। ত্রয়োদশ শতকে চেঙ্গিজ খাঁর নেতৃত্বে মোঙ্গলগণ বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে।

'মুঘল' শব্দের উৎপত্তি

বাবর

ভারতে যে রাজবংশ মুঘল বংশ নামে পরিচিত, সেই বংশের শাসকগণ ছিলেন তুর্কী জাতির চাগতাই শাখাভুক্ত।

বাবর ঃ ভারতে মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বাবর। তিনি ছিলেন তুর্কী জাতির চাগতাই শাখাভুক্ত। কিন্তু তিনি এবং তাঁহার বংশধরগণ এ দেশে চাগতাই তুর্কীরূপে পরিচিত না হইয়া মুঘল নামে পরিচিত ছিলেন।

বাবরের সঙ্গে অবশ্য মোঙ্গলগণের সম্পর্ক ছিল। বাবর মাতৃসূত্রে ছিলেন চেঙ্গিজ খাঁর বংশধর। বাবরের পিতা ছিলেন মধ্য এশিয়ার ক্ষুদ্র রাজ্য ফরঘনার অধিপতি এবং বিখ্যাত চাগতাই তুর্কী বীর তৈমুরলঙ্গের বংশধর।

বংশপরিচয়

সুতরাং বাবরের ধমনীতে মধ্য এশিয়ার দুইজন শ্রেষ্ঠ বীরের রক্ত প্রবাহিত ছিল।

১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের জন্ম হয়। মাত্র এগার বছর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন এবং ফরঘনার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে পূর্বপুরুষ তৈমুরের রাজধানী সমরকন্দ অধিকার করেন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তাঁহাকে সমরকন্দ হারাইতে হয়। এমনকি বাবর তাঁহার পিতৃরাজ্য ফরঘনাও হারাইলেন। কিছুকাল বাবরকে ভাগ্যান্বেষণে ঘুরিতে হয়, অবশেষে ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে কাবুল অধিকার করেন। কাবুল অধিকারের পর বাবর পুনরায় পারস্যের শাহের সাহায্য গ্রহণ করিয়া সমরকন্দ অধিকারের ব্যর্থ চেষ্টা করেন। ১৫২২ খ্রীষ্টাব্দে বাবর কান্দাহার অধিকার করেন।

প্রথম জীবন

বাবর মধ্য এশিয়ায় সাফল্য লাভ না করিয়া ভারতের প্রতি দৃষ্টিদান করেন। বাবর নিজেকে তৈমুরের বংশধর হিসাবে দিল্লীর স্থলতানের সিংহাসনের ন্যায়সঙ্গত দাবিদার মনে করিতেন। তিনি ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের অন্তর্গত দীপালপুর আক্রমণ করেন। পর বৎসর বাবর পুনরায় আগমন করিয়া পাঞ্জাবের আফগান শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদীকে পরাজিত করিয়া দিল্লীর স্থলতানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দিল্লীর স্থলতান ইব্রাহিম লোদীর সেনাবাহিনীর সহিত পানিপথের প্রান্তরে বাবরের সেনাবাহিনীর যুদ্ধ হয়। আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিয়া বাবর ইব্রাহিম লোদীর বিশাল সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করেন। ইব্রাহিম লোদী স্বয়ং নিহত হন। ঐ যুদ্ধ ইতিহাসে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ নামে খ্যাত। ঐ যুদ্ধে জয়লাভের ফলে বাবর ভারতে মুঘল শাসনের ভিত্তি রচনা করেন। অল্পদিনের মধ্যে বাবর এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ূন দিল্লী, আগ্রা, মুলতান, গোয়ালিয়র এমন কি বিহার পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেন।

ভারত আক্রমণ

ইব্রাহিম লোদীর পরাজয়

ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধে জয়লাভের পর বাবরকে অধিক শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হইতে হয়। মেবারের রানা **সংগ্রামসিংহ** এবং আফগানগণ বাবরের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হন। রানা সংগ্রামসিংহ মনে করিয়াছিলেন যে বাবর তৈমুরের ন্যায় লুণ্ঠন করিয়াই ভারত ত্যাগ করিবেন, কিন্তু বাবর স্থায়িভাবে আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকায় সংগ্রামসিংহ বাবরের বিরোধিতা করেন। সংগ্রামসিংহ ছিলেন বহু যুদ্ধের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রসিদ্ধ বীর। তিনি ইব্রাহিম লোদীর ন্যায় তরুণ অনভিজ্ঞ সেনানায়ক ছিলেন না। সংগ্রামসিংহ উত্তর ভারতে হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে আগ্রহী ছিলেন। ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে সিক্রীর নিকট খানুয়ার প্রান্তরে উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ ঘটে। বাবর এই যুদ্ধেও আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারের দ্বারা জয়লাভ করেন। বাবর রানার বিশ্বস্ত অনুচর মেদিনী রাইকে পরাজিত করিয়া মালবের চন্দেরী দুর্গটিও অধিকার করিলে, কিছুকাল পরে রানা ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন।

খানুয়ার যুদ্ধে রানা সংগ্রামসিংহের পরাজয়

অতঃপর বাবর পূর্বাঞ্চলের আফগানদিগের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। বিহারের আফগানগণ ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে গোগ্রার যুদ্ধে পরাজিত হন। বাংলার সুলতান নসরৎ শাহও বাবরের সহিত সন্ধি করেন।

গোগ্রার যুদ্ধ

১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যু হয়। মাত্র চারি বৎসরের মধ্যে বাবর সুদক্ষ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার অবকাশ পান নাই।

চরিত্র

বাবর ছিলেন সংগীতপ্রিয় এবং সাহিত্যানুরাগী। তাঁহার রচিত বহু কবিতা এবং আত্মজীবনী তাঁহার সাহিত্য সম্বন্ধে অনুরাগের পরিচায়ক।

হুমায়ুন ঃ বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ূন দিল্লীর সিংহাসন লাভ করেন। তিনি তাঁহার অপর তিন ভ্রাতার সহিত পিতৃরাজ্য বণ্টন করিয়া লইলেন। বাবরের এক পুত্র কামরান কাবুল ও কান্দাহার লাভ করেন। হুমায়ূন কামরানকে পাঞ্জাবও ছাড়িয়া দেন এবং প্রচণ্ড

ভুল করেন, কারণ কামরানের বিরোধিতার জন্য হুমায়ূন পাঞ্জাব হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। হুমায়ূনের অপর দুই ভ্রাতা হিন্দাল সম্ভল এবং আসকারী মেওয়াট লাভ করেন।

সিংহাসন লাভ

সিংহাসনে আরোহণের পর হুমায়ূনকে নানাপ্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। বাবর সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার অবকাশ লাভ করেন নাই। ইহা ব্যতীত সৈন্যবাহিনীতেও সংহতির অভাব ছিল। কামরানের শক্রতার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। বাবর আফগান শক্তিকেও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিতে পারেন নাই। গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহও ছিলেন হুমায়ূনের প্রবল শক্র। ঐ সকল প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করিবার মত যোগ্যতা হুমায়ূনের ছিল না।

হুমায়ূনের অসুবিধা

হুমায়ূন

হুমায়ূন সিংহাসনে আরোহণের অল্পকাল পরেই কালঞ্জরের হিন্দু রাজাকে পরাস্ত করেন এবং জৌনপুর অধিকার করেন। অতঃপর তিনি চুনার দুর্গের আফগান অধিপতি শের খাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। শের খাঁ বশ্যতা স্বীকার করিলে হুমায়ূন শের খাঁকে চুনার দুর্গ প্রত্যর্পণ করিয়া মারাত্মক ভুল করেন। ঐ ভুলের জন্যও হুমায়ূনকে সাময়িকভাবে রাজ্যচ্যুত হইতে হয়। অতঃপর হুমায়ূন গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। বাহাদুর শাহ দিউতে পলায়ন করেন।

প্রতিদ্বন্দ্বীদের দমন

হুমায়ুন গুজরাট ও মালব অধিকার করেন। কিন্তু বাহাদুর শাহ অল্পকাল পরেই পর্তুগীজদের সহায়তায় গুজরাট পুনরুদ্ধার করেন। মালবও হুমায়ূনের অধিকার-মুক্ত হয়।

হুমায়ূন ও বাহাদুর শাহ

হুমায়ূন ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বিনা বাধায় গৌড় অধিকার করিয়া ছয় মাস আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকেন। ঐ সময়ে শের খাঁ বারাণসী ও জৌনপুর অধিকার করিয়া কনৌজ পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেন।

হুমায়ূন ও শের খাঁ

হুমায়ূন পর বৎসর বক্সারের নিকট চৌসা নামক স্থানে শের খাঁর নিকট পরাজিত হন। অতঃপর শের খাঁ শের শাহ উপাধি ধারণ করিয়া স্বাধীন শাসকের পরিচয় দান করেন। ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ূন পুনরায় শের শাহের নিকট শক্তি পরীক্ষায় পরাজিত হন। কনৌজের নিকট বিলগ্রামের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া হুমায়ূন ভ্রাতাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাঁহার নিদারুণ দুর্দিনে কোন প্রকার সাহায্য লাভ না করিয়া রাজ্যহারা হুমায়ূন অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়া ভারত ত্যাগ করেন। পারস্যের পথে অমরকোটে আকবরের জন্ম হয়। ভারতে মুঘল শাসনের সাময়িক অবসান ঘটে। ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ আদিল শাহের আমলে আফগানদের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে হুমায়ূন লাহোর, দিল্লী ও আগ্রা পুনরুদ্ধার করিয়া মুঘল শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই এক দুর্ঘটনায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

পরাজয় ও ভারত ত্যাগ

শের শাহঃ শের খাঁর প্রকৃত নাম ছিল ফরিদ। ১৪৮৬ (মতান্তরে ১৪৭২) খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা হাসান শূর ছিলেন বিহারের সাসারামের জায়গীরদার।

ফরিদের বাল্যকাল সুখে অতিবাহিত হয় নাই। বিমাতার চক্রান্তে তাঁহাকে অল্প বয়সে গৃহত্যাগ করিতে হয়। তিনি জৌনপুরে গমন করিয়া পারসিক ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কিছুকাল পরে

গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া জায়গীরের শাসনকার্য পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে থাকেন। কিন্তু কিছুকাল পরে বিমাতার চক্রান্তে তাঁহাকে পুনরায় গৃহত্যাগ করিতে হয়। তিনি কিছুকালের জন্য আগ্রায় অবস্থান করেন। পিতার মৃত্যুর পর জায়গীর লাভ করেন।

প্রথম জীবন

ফরিদ ১৫২২ খ্রীষ্টাব্দে বিহারের শাসক বাহার খাঁ লোহানীর অধীনে কর্ম গ্রহণ করেন। স্বহস্তে তরবারির সাহায্যে একটি ব্যাঘ্রকে হত্যা করিয়া তিনি শের খাঁ উপাধিতে ভূষিত হন। কিন্তু বিরোধীদের চক্রান্তে তিনি জায়গীরচ্যুত হন। পানিপথের প্রথম যুদ্ধের পর তিনি মুঘলদের অধীনে কর্ম গ্রহণ করেন এবং পুনরায় জায়গীর লাভ করেন।

শের খাঁ উপাধি লাভ

শের শাহ

১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিহারের বাহর খাঁর পুত্র নাবালক শাসক জালাল খাঁর অভিভাবক নিযুক্ত হন এবং আপন ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে শের খাঁ চুনার দুর্গ অধিকার করেন এবং পর বৎসর হুমায়ূন দুর্গটি অধিকার করিলে তিনি হুমায়ূনের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়া চুনার দুর্গের উপর অধিকার বজায় রাখেন।

ক্ষমতা বৃদ্ধি

শের খাঁর শক্তিবৃদ্ধিতে অন্যান্য আফগান সর্দারগণ ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বাংলার সুলতানের সহিত যোগদান করেন। জালাল খাঁও বিহার হইতে পলায়ন করিয়া বাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে শের খাঁ সুরজগড়ের যুদ্ধে ঐ সম্মিলিত বিরোধী পক্ষকে পরাজিত করেন। শের খাঁ বাংলা আক্রমণ করিলে বাংলার

সুরজগড়ের যুদ্ধে জয়লাভ

সুলতান শের খাঁর সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শের খাঁ পুনরায় বাংলায় আগমন করিয়া গৌড় অবরোধ করিলে হুমায়ূন তাঁহাকে দমন করিতে মনস্থ করেন, এবং বিনা বাধায় গৌড় অধিকার করেন। হুমায়ূন যখন গৌড়ে আমোদ-প্রমোদে মগ্ন শের খাঁ সেই সময়ে বারাণসী ও জৌনপুর অধিকার করিয়া হুমায়ূনকে তাঁহার রাজধানী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলে হুমায়ূন অসুবিধার সম্মুখীন হন। ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে চৌসার যুদ্ধে হুমায়ূনকে পরাজিত করিয়া তিনি 'শের শাহ' উপাধি গ্রহণ করেন। পর বৎসর বিলগ্রামের যুদ্ধে হুমায়ূন পুনরায় পরাজিত হন। হুমায়ূন পারস্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। হুমায়ূনের ভ্রাতা কামরান পাঞ্জাব পরিত্যাগ করেন। অতঃপর শের শাহ মালব জয় করেন। রায়সিনের দুর্গটি জয় করিবার কালে শের শাহ চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেন। রাঠোররাজ মালদেবের সহিত যুদ্ধে তিনি শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। আজমীর, যোধপুর, মাউন্ট আবু এবং চিতোরে তিনি সৈন্য মোতায়েন রাখেন। ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কালঞ্জর দুর্গ অবরোধের সময়ে এক আকস্মিক বিস্ফোরণের ফলে শের শাহের অকালমৃত্যু ঘটে।

হুমায়ূনের বিরুদ্ধে সাফল্য

শের শাহের শাসন ব্যবস্থা ঃ শের শাহ কেবলমাত্র বীর যোদ্ধাই ছিলেন না, তিনি সুদক্ষ শাসকও ছিলেন। উন্নত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

শাসনের সুবিধার জন্য তিনি সাম্রাজ্যকে কয়েকটি পরগনায় বিভক্ত করেন। কয়েকটি পরগনা লইয়া একটি সরকার গঠিত হইত। সরকারগুলির দায়িত্ব একজন শিকদার-ই-শিকদারন এবং একজন মুন্সীর-ই-মুন্সীফন্ নামক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর উপর ন্যস্ত ছিল।

শের শাহ জমি জরিপের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। রাজস্বের হার কঠোর ছিল না। কিন্তু রাজস্ব কঠোর ভাবে আদায় করা হইত। উৎপন্ন শস্যের ⅓ অংশ রাজস্ব হিসাবে ধার্য হইত। শস্য এবং অর্থে খাজনা দেওয়া চলিত। জমির উপর স্বত্ব নির্দিষ্ট করিবার জন্য তিনি

কবুলিয়ত ও পাট্টার প্রচলন করেন। প্রজাদিগকে জমি জরিপের ব্যয় এবং রাজস্ব আদায়কারিগণের বেতনের জন্য অর্থও দিতে হইত। শের শাহ জায়গীর প্রথার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ঐ প্রথাকে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করিতে সক্ষম হন নাই।

রাজস্ব নীতি

শের শাহ মুদ্রার সংস্কার করেন। তাঁহার আমলে নানাপ্রকার রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন হয়। বাণিজ্যের প্রসারের প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি ছিল। যে সকল শুল্ক বাণিজ্য প্রসারের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করিত তিনি সেই সকল শুল্ককে উচ্ছেদ করিয়া দেন।

মুদ্রা নীতি

শের শাহের আমলে নিয়মিত ডাক চলাচল শুরু হয়।

আলাউদ্দীন খলজীর ন্যায় তিনিও অশ্বের মান নির্ণয়ের জন্য রাজসরকারের অশ্বগুলিকে চিহ্নিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

শের শাহ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির প্রতি দৃষ্টি দান করেন। তাঁহার আমলে বহু রাজপথ নির্মিত হয়। তাহাদের মধ্যে পাঞ্জাব হইতে বাংলা দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড বিশেষ প্রসিদ্ধ। পথিকদের সুবিধার জন্য ঐ সকল রাজপথের দুই পার্শ্বে বৃক্ষ রোপণ, স্থানে স্থানে পান্থশালা নির্মাণ করেন। ঐ সকল পান্থশালার সংখ্যা ছিল প্রায় ১৭০০।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি

ন্যায়বিচার প্রবর্তনের জন্য শের শাহের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। রাজ-কর্মচারিগণ যাহাতে জনসাধারণের উপর অত্যাচার করিতে না পারে তাহার প্রতিও তিনি সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। বিচার কালে কোনও প্রকার পক্ষপাতিত্ব যাহাতে না করা হয় তাহারও ব্যবস্থা ছিল।

বিচার বিভাগ

শাসন বিভাগের ন্যায় বিচার বিভাগেরও তিনি ছিলেন শীর্ষে। ন্যায়বিচারের জন্য বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত হইতেন।

শের শাহ পুলিস বিভাগেও সংস্কার প্রবর্তন করেন। গ্রামের শান্তিরক্ষার ভার গ্রামের প্রধান ব্যক্তিগণের উপর ন্যস্ত ছিল।

শের শাহের বিশাল সামরিকবাহিনী ছিল। তাঁহার দেড় লক্ষ অশ্বারোহী, পঁচিশ সহস্র পদাতিক এবং বহু রণহস্তী ছিল। অশ্ব চিহ্নিত করণ এবং সামরিক কর্মচারিগণের সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা ছিল। তিনি নানাস্থানে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেন।

সামরিক সংগঠন

শেরশাহ ইসলাম ধর্মে শ্রদ্ধাবান ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন পরধর্মসহিষ্ণু। তাঁহার সেনাপতি ছিলেন ব্রহ্মজিৎ গৌড়, ধর্মে হিন্দু। পরবর্তী কালে আকবর তাঁহার উদার ধর্মনীতির অনুসরণ করেন।

শেরশাহ স্বয়ং ছিলেন সুশিক্ষিত, সেই কারণে তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি শিল্পের পৃষ্ঠপোষকরূপে খ্যাত। দিল্লীর 'পুরান কিল্লা' তাঁহার শিল্পকীর্তির অন্যতম নিদর্শন। সাসারামে তাঁহার যে সমাধি-মন্দির রহিয়াছে তাহা ঐ যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি। ঐ ধরনের শিল্প-নিদর্শন ঐ যুগে বিরল।

শিল্প
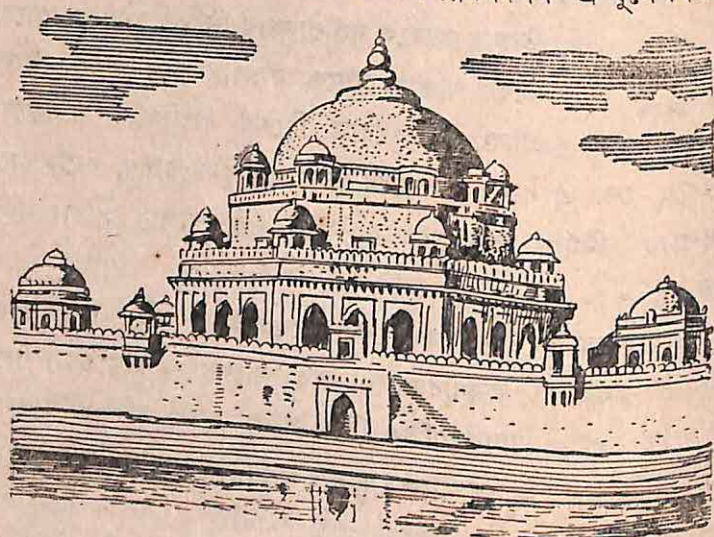
শের শাহের সমাধি

শেরশাহ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। একজন সামান্য জায়গীরদারের অবহেলিত পুত্ররূপে জীবন শুরু করিয়া তিনি শেষ পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। তিনি হুমায়ুনকে

পরপর দুইটি যুদ্ধে পরাজিত করিয়া এদেশ হইতে মুঘল শাসনের সাময়িক অবসান ঘটাইয়া আফগান শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

কৃতিত্ব

শেরশাহ কেবল যোদ্ধাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন সুদক্ষ শাসক। মাত্র পাঁচ বৎসরের মধ্যে তিনি যে প্রকার উন্নত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখেন তাহা শ্রদ্ধা এবং বিস্ময়ের উদ্রেক করে। তিনি প্রজাপালক নরপতি ছিলেন। প্রজাদের সুখ-দুঃখের প্রতি তাঁহার পূর্ণ দৃষ্টি ছিল, প্রজাবর্গ করভারেও জর্জরিত ছিল না।

আকবর: ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর (মতান্তরে ২৩শে নভেম্বর) অমরকোট নামক স্থানে আকবরের জন্ম হয়। পিতা হুমায়ূনের চরম দুর্দিনে (রাজ্যহারা অবস্থায়) তাঁহার জন্ম হওয়ায় এবং বাল্যকাল অতিবাহিত হওয়ায় তাঁহার পক্ষে বিদ্যাচর্চার অবকাশ ঘটে নাই। হুমায়ূনের মৃত্যু হইলে আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আকবর

সিংহাসন লাভ

সিংহাসনে আরোহণকালে তাঁহার বয়স ছিল মাত্র তের। নাবালক শাসক আকবরের অভিভাবক রূপে হুমায়ূনের বিশ্বস্ত বন্ধু বৈরাম খাঁ শাসনকার্য পরিচালনা করিতে থাকেন।

হুমায়ূন মুঘলশক্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলেও আফগানদের শক্তি বিনষ্ট করিবার অবকাশ পান নাই। আফগানগণও আধিপত্য বিস্তারে আগ্রহী ছিল। শের শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র আদিল শাহের মন্ত্রী

হিমু পঞ্চাশ সহস্র অশ্বারোহী, এক সহস্র হস্তী এবং একান্নটি কামানসহ দিল্লী ও আগ্রা জয় করিতে অগ্রসর হন। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে আফগানদের পরাজয় ঘটে। হিমু স্বয়ং আহত ও বন্দী হন। এই যুদ্ধে জয়লাভ না করিলে মুঘলদের পক্ষে এদেশে সাম্রাজ্য বিস্তার করা সম্ভবপর হইত কিনা সন্দেহ।

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে মুঘলদের জয়লাভ

আকবরের রাজত্বকালের প্রথম চারি বৎসর বৈরাম খাঁ অভিভাবক হিসাবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। মুঘল শক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁহার অবদান ছিল অপরিসীম। রাজ্য বিপদমুক্ত হইলে সুন্নিগণের বিরোধিতার ফলে বৈরাম খাঁর কর্তৃত্বের অবসান ঘটে।

বৈরাম খাঁর পতন

বৈরাম খাঁর অপসারণের পর কিছুকাল আকবরের ধাত্রীমাতা মহম অনগের প্রভাবে শাসনকার্য পরিচালিত হয়। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে আকবর স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করেন। অতঃপর মুঘল শক্তির ইতিহাস নূতন খাতে প্রবাহিত হইতে শুরু করে।

রাজ্যবিস্তার : বাবর এদেশে মুঘল শাসনের সূত্রপাত করিলেও, মুঘল শাসনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আকবর। তিনি এদেশে বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণের পূর্বে আজমীর, গোয়ালিয়র, জৌনপুর এবং মালব বিজিত হয়। আকবর স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া ভূখণ্ড বিস্তারে মনোনিবেশ করেন।

১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আকবর তাঁহার সেনাপতি আসফ খাঁকে মধ্য-ভারতের গণ্ডোয়ানা নামক হিন্দু রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। গণ্ডোয়ানার রাজা ছিলেন নাবালক বীরনারায়ণ, তাঁহার অভিভাবিকা ছিলেন মাতা রানী দুর্গাবতী। পরাজয় সুনিশ্চিত জানিয়া রানী দুর্গাবতী আত্মহত্যা করেন এবং বীরনারায়ণ যুদ্ধে নিহত হন। গণ্ডোয়ানা বিজিত হয়।

গণ্ডোয়ানা

রাজপুতানায় আকবর প্রথমে বাহুবলের প্রয়োগ না করিয়া বন্ধুত্ব স্থাপনের মাধ্যমে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেন। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে অম্বর রাজ্যের অধিপতি বিহারীমল বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করিয়া আকবরকে কন্যাদান করেন। তিনি পাঁচ হাজারী মনসবদারে পরিণত হন। তাঁহার পুত্র ভগবানদাস এবং পৌত্র মানসিংহও মুঘল দরবারে সম্মানে ভূষিত হন।

রাজপুতানার নীতি

রাজপুতানার অপর কয়েকটি রাজ্য অম্বরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। ঐ সকল রাজ্যগুলির মধ্যে যোধপুর বা মারবার, বিকানীর, যশলমীর, বুন্দী, সিরোহী প্রভৃতি রাজ্য উল্লেখযোগ্য। রাজপুতানার একাধিক রাজ্যের শাসকগণের সহিত মুঘলদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আকবরের রাজত্বকালে রাজপুতগণ মুঘলসাম্রাজ্য বিস্তারে উল্লেখযোগ্য সাহায্যদান করেন। কিন্তু মেবারের শিশোদীয় বংশীয় রানাগণ তাঁহাদের পূর্বপুরুষ সংগ্রামসিংহের দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া মুঘলদের বিরুদ্ধে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া সংগ্রামে লিপ্ত হন। বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রস্তাব ব্যর্থ হওয়ায় আকবর মেবারের রাজধানী চিতোর আক্রমণ করেন। রানা উদয়সিংহ কয়েকজন অনুচরসহ মেবারের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

অম্বর প্রভৃতির বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার

আকবর ও মেবার

উদয়সিংহের দুই সেনাপতি জয়মল্ল ও পুত্ত রাজপুত বীর সৈনিকগণের সহায়তায় দীর্ঘ চারিমাস অবরুদ্ধ অবস্থায় মুঘল বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করেন। জয়মল্ল গোলার আঘাতে নিহত হন এবং পুত্ত যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মত মৃত্যু বরণ করেন। রাজপুত বীরাঙ্গনাগণ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দিয়া জহর ব্রত পালন করেন। চিতোরের পতন হয়। ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে চিতোরের পতন হইলেও রানা উদয়সিংহ উদয়পুরে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া মেবার শাসন করিতে থাকেন।

চিতোরের পতন

সমগ্র মেবারে আকবর মুঘল আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হন নাই।

রানা প্রতাপসিংহের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ঃ রানা উদয়সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র প্রতাপসিংহ রানা হন। তিনি ছিলেন স্বাধীনতার একনিষ্ঠ পূজারী। মুঘলদের তুলনায় সামান্য অর্থবল এবং লোকবল লইয়া তিনি দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর কাল মুঘলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া অমরত্বলাভ করিয়াছেন। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সেনাপতি মানসিংহের নেতৃত্বাধীন এক বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে গোগুণ্ডা বা হলদীঘাটের যুদ্ধে অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াও রানা প্রতাপ পরাজিত হন। মুঘলবাহিনী মেবারের বহু সুরক্ষিত স্থান অধিকার করে। কিন্তু প্রতাপসিংহ নতি স্বীকারের পরিবর্তে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অদম্য উৎসাহে মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে তিনি চিতোর এবং মণ্ডলগড় ব্যতীত সকল স্থান মুঘল-দিগের নিকট হইতে উদ্ধার করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় মাত্র ৫৭ বৎসর বয়সে এই মহাপ্রাণ দেশপ্রেমিকের অকাল মৃত্যু ঘটে। প্রতাপসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অমরসিংহ দীর্ঘকাল সংগ্রাম করেন।

হলদীঘাটের যুদ্ধ

রানা প্রতাপসিংহ

চিতোরে মুঘল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর রণথম্ভোর এবং কালঞ্জর নতি স্বীকার করে।

অতঃপর আকবর গুজরাট জয় করিতে মনস্থ করেন। ঐ সময়ে গুজরাটের সুলতান ছিলেন তৃতীয় মুজঃফর শাহ। তাঁহার অযোগ্যতায় গুজরাটে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আকবর সসৈন্যে আহম্মদাবাদের নিকট আগমন করিলে মুজঃফর স্বেচ্ছায় নতি স্বীকার করেন।

গুজরাট জয়

গুজরাট জয়ের পর আকবর পূর্ব ভারত জয়ে মনোনিবেশ করেন। ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে আকবর স্বয়ং বিহারে আগমন করেন এবং সেনাপতি টোডরমল এবং মুনিম খাঁর উপর বাংলা জয়ের দায়িত্বভার ন্যস্ত করেন। বাংলার সুলতান দায়ুদ খাঁ পরাজিত হইয়া সন্ধি করেন। কিন্তু দায়ুদ সন্ধি ভঙ্গ করিলে পুনরায় যুদ্ধ হয়। দায়ুদ পরাজিত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। বিহার ও বাংলায় মুঘল আধিপত্যের সূচনা হয়। কিন্তু বাংলায় মুঘল আধিপত্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা হয় আরও বেশ কয়েক বৎসর পরে। বাংলার 'বারো ভুঁইয়াগণ' দীর্ঘকাল মুঘলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। তাঁহাদের দমনের পরই বাংলায় মুঘল শক্তির প্রকৃত প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।

বাংলা জয়

কাবুলের শাসক এবং আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মীর্জা মহম্মদ হাকিমের মৃত্যুর পর কাবুলে আকবরের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

কাবুল

১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে মুঘলগণ উড়িষ্যা অধিকার করে। উত্তর ভারত মুঘল শক্তির শাসনাধীন হইয়া পড়ে।

অতঃপর আকবর দক্ষিণ ভারত জয়ের জন্য দক্ষিণ ভারতের খান্দেশ, আহম্মদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা নামক চারিটি রাজ্যের শাসকগণের নিকট অধীনতা স্বীকারের প্রস্তাবসহ দূত প্রেরণ করেন। খান্দেশের সুলতান বিনাযুদ্ধে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন।

দাক্ষিণাত্য জয়ের প্রচেষ্টা

আহম্মদনগরের নাবালক সুলতানের পক্ষে তাঁহার আত্মীয়া

এবং বিজাপুরের সুলতানের মহিষী চাঁদবিবি মুঘল আক্রমণ প্রতিহত করেন। ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দের এক সন্ধিতে আহম্মদনগর বেরার প্রদেশ আকবরকে ছাড়িয়া দিয়া নতি স্বীকার করে। চাঁদবিবির মৃত্যুর পর পুনরায় সংঘর্ষ বাধিলে মুঘল-

আহম্মদনগর

বাহিনী আহম্মদনগর শহর অধিকার করে, অবশ্য আহম্মদনগর রাজ্যের অস্তিত্ব থাকিয়া যায়।

খান্দেশের সুলতান সন্ধির শর্ত অগ্রাহ্য করিলে আকবর খান্দেশের

রাজধানী বুরহানপুর অধিকার করেন। সুলতান অসীরগড়ের দুর্ভেদ্য

খান্দেশ

দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল অবরোধের পর ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গের পতন হয়। অতঃপর আকবরের রাজ্যবিস্তারের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ হয়। যুবরাজ দানিয়েল আহম্মদনগর, বেরার ও খান্দেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন।

শাসন ব্যবস্থা ঃ আকবর কেবল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাই করেন নাই, তিনি উন্নত শাসন ব্যবস্থাও প্রবর্তন করেন। তাঁহার শাসন ব্যবস্থায় শেরশাহের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তাঁহার শাসন ব্যবস্থায়

কেন্দ্রীয় শাসন

সম্রাটের আসন ছিল শীর্ষে। কেন্দ্রে দেওয়ান, মীর বকসী, সদর, মীর শামান প্রভৃতি মন্ত্রী, দারোগা-ই-ডাকচৌকী, দারোগা-ই-ঘুসলখানা, মীর আরজ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারিগণ সম্রাট্‌কে সাহায্য করিতেন।

তাঁহার সাম্রাজ্য পনেরটি সুবায় (প্রদেশ) বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক

প্রাদেশিক শাসন

সুবার শীর্ষে একজন সুবাদার এবং তাঁহাকে সাহায্যের জন্য একজন দেওয়ান থাকিতেন। ফৌজদার, সদর, আমিন, বিতিক্‌চি এবং বড় বড় শহরে একজন কোতোয়াল থাকিতেন।

আকবর জায়গীর প্রথার পক্ষে ছিলেন না। তিনি মনসব প্রথার

মনসব প্রথা

প্রচলন করেন। দশজন হইতে দশ সহস্র সৈন্যের মনসবদার থাকিতেন। মনসবদারগণ প্রয়োজনে সৈন্য সরবরাহ করিতেন। পৃথক্ বিচার বিভাগ ছিল না, উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ বিচারকের কার্য পরিচালনা করিতেন। সাধারণ বিচার ব্যবস্থা কাজীর উপর ন্যস্ত ছিল।

রাজস্ব নীতি ঃ টোডরমল সুদক্ষ রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। জমি জরিপ করিয়া জমির উৎপাদিকা শক্তির উপর জমিকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া খাজনা নির্ধারণ করা হইত। উৎপন্ন শস্যের ⅓ অংশ শস্যে অথবা নগদে কর হিসাবে প্রদান করা চলিত।

উদার ধর্মনীতি ঃ শেরশাহের ন্যায় আকবর হিন্দুদের সহিত

সদ্ব্যবহার করিতেন। তিনি বহু হিন্দুকে উচ্চ সরকারী পদে নিয়োগ করেন। তিনি হিন্দুদের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং জিজিয়া কর রহিত করেন। আকবর পরবর্তী কালে উদার ধর্মনীতির অনুসরণ করেন। ফতেপুরসিক্রীর 'ইবাদৎখানা'য় মুসলমান, হিন্দু, জেন, খ্রীষ্টান, পারসিক সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতগণ ধর্মালোচনা করিতেন। আকবর সকল ধর্মের সমন্বয়ে **দীন-ইলাহি** নামক এক ধর্মের প্রচার করেন, যদিও তিনি ঐ ধর্মমত গ্রহণের জন্য কাহাকেও পীড়াপীড়ি করেন নাই।

বিদ্যোৎসাহিতা

আকবর স্বয়ং বিদ্বান্ ছিলেন না, কিন্তু বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ঐতিহাসিক আবুল ফজল, কবি ফৈজী, গায়ক তানসেন, রাজবাহাদুর এবং বীরবল, টোডরমল প্রভৃতি জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁহার দরবার অলংকৃত করিতেন। ইহা ব্যতীত ঐতিহাসিক বদাউনী, নিজামউদ্দীন এবং কবি তুলসীদাস ও সুরদাস তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন।

শিল্প ও স্থাপত্য

আকবরের আমলে শিল্প ও স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়। তাঁহার রাজত্বকালের সূচনায় দিল্লীতে হুমায়ূনের সমাধি-মন্দির নির্মিত হয়। তিনি আগ্রা, লাহোর এবং ফতেপুর-সিক্রীতে প্রাসাদদুর্গ নির্মাণ করেন। ফতেপুর-সিক্রীর 'বুলন্দ্ দরওয়াজা' বিশেষ প্রসিদ্ধ। ফতেপুরসিক্রীর আরও অনেক প্রাসাদ বিখ্যাত। সেকেন্দ্রায় তাঁহার সমাধি-মন্দিরের পরিকল্পনা সম্ভবতঃ তাঁহার আমলেই গৃহীত হয়। ভারতের মুসলমান শাসকগণের মধ্যে নিঃসন্দেহে আকবরকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে।

খসরুর বিদ্রোহ

জাহাঙ্গীর: ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম 'নূরউদ্দীন মহম্মদ জাহাঙ্গীর পাদশাহ কাজী' উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরু বিদ্রোহী হন। খসরুর বিদ্রোহ দমনের পর খসরুকে দৃষ্টিশক্তিহীন করা হয়।

জাহাঙ্গীরের রাজ্যলাভের কিছুকাল পূর্বে শিখগুরু অর্জুন শিখদের ধর্মগ্রন্থ আদি গ্রন্থ বা গ্রন্থসাহেব সংকলন করেন। ঐ সময়ে শিখগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শিখগণের শক্তিবৃদ্ধির অমূলক সন্দেহে রাজদ্রোহের অপরাধে শিখ-গুরু অর্জুনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ঐ ঘটনার পর হইতে শিখগণের সহিত মুঘলদের সংঘর্ষের সূচনা হয়।

গুরু অর্জুনের প্রাণদণ্ড

জাহাঙ্গীর

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তাঁহার পত্নী **'নূরজাহান'** অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেন। নূরজাহানের পূর্ব নাম মেহেরউন্নিসা। তাঁহার পিতা পারস্য দেশ হইতে আগমন করিয়া আকবরের অধীনে কর্মগ্রহণ করেন। মেহেরউন্নিসা অসামান্য রূপবতী ছিলেন। তাঁহার সহিত বর্ধমানের জায়গীরদার আলি কুলি ইস্তাজলুর (শের আফগান) বিবাহ হয়। জাহাঙ্গীরের সিংহাসন লাভের পর বিদ্রোহের অজুহাতে শের আফগান নিহত হন। মেহেরউন্নিসা এক কন্যাসহ আগ্রা গমন করেন। চারি বৎসর পরে মেহেরউন্নিসার সহিত জাহাঙ্গীরের বিবাহ হয়। বিবাহের পর 'নূরজাহান' (জগতের আলো) নামে মেহেরউন্নিসা ভূষিত হন। বিবাহের পর নূরজাহান জাহাঙ্গীরের উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেন। জাহাঙ্গীরের মুদ্রায় তাঁহার নাম খোদিত হইত। নূরজাহানের পিতা ইতিমদ্দৌল্লা জাহাঙ্গীরের প্রধান মন্ত্রী এবং ভ্রাতা আসফ খাঁ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের শেষ ভাগে সাম্রাজ্যের প্রকৃত শাসন ক্ষমতা তাঁহার নিয়ন্ত্রণে ছিল।

'নূরজাহান'-এর পরিচিতি

'নূরজাহান'-এর প্রভাব

জাহাঙ্গীরের আমলে মেবারের রানা অমরসিংহ নতি স্বীকার করেন। রানা অমরসিংহের সহিত সম্মানজনক শর্তে সন্ধি হয়। রানা মুঘল দরবারে উপস্থিত থাকিবার এবং কন্যাদান করিবার বিষয়ে অব্যাহতি লাভ করেন। অপর কোন রাজপুত শাসক ঐরূপ সম্মান লাভ করেন নাই।

মেবার বিজয়

১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত কাংড়া দুর্গ অধিকৃত হয়।

জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলায় মুঘল আধিপত্য সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। মানসিংহ এবং ইসলাম খাঁ বাংলার সুবাদার থাকাকালে বারো ভুঁইয়াদের শক্তি চূর্ণ করেন। ইসলাম খাঁর হস্তে ওসমান খাঁ, প্রতাপাদিত্য, ঈশা খাঁর পুত্র মুসা খাঁ প্রভৃতি পরাজিত হন। ইসলাম খাঁ কোচবিহারের পূর্বাংশ, শ্রীহট্ট জয় করেন এবং কাছাড় আক্রমণ করেন। তিনি রাজমহল হইতে ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ঢাকার নাম রাখা হয় 'জাহাঙ্গীর নগর'।

বাংলায় আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা

জাহাঙ্গীরের আমলে খুররম্ আহম্মদনগর এবং কয়েকটি দুর্গ জয় করেন। **মালিক অম্বর** নামক জনৈক হাবসী মন্ত্রীর পরিচালনায় আহম্মদনগরের একাংশ শক্তিসঞ্চয় ও মুঘল আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া আসিতেছিল। সুদক্ষ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া এবং রাজস্ব সংস্কার করিয়া তিনি আহম্মদনগরের শক্তি বৃদ্ধি করেন। তিনি খিড়কীতে (ঔরঙ্গাবাদ) নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। আহম্মদনগরের বিরুদ্ধে সাফল্যের জন্য জাহাঙ্গীর খুররম্‌কে 'শাহজাহান' উপাধিতে ভূষিত করেন।

মালিক অম্বর

১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে পারস্যের অধিপতি শাহ আব্বাস এক আকস্মিক আক্রমণে কান্দাহার অধিকার করেন। শাহজাহানের বিদ্রোহের জন্য কান্দাহার পুনরুদ্ধার করা সম্ভবপর হয় নাই।

কান্দাহার হস্তচ্যুত

জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষ ভাগে শাহজাহান বিদ্রোহী হন। নূরজাহান তাঁহার জামাতা এবং জাহাঙ্গীরের এক পুত্র শাহরীয়রকে সিংহাসনে বসাইবার ষড়যন্ত্র করিলে শাহজাহান বিদ্রোহী হন। সেনাপতি মহবৎ খাঁ ঐ বিদ্রোহ দমন করেন, কিন্তু নূরজাহানের কর্তৃত্বে বিরক্ত হইয়া তিনি স্বয়ং বিদ্রোহী হন। কাবুল যাইবার পথে জাহাঙ্গীর ও নূরজাহান তাঁহার হস্তে বন্দী হন। কিন্তু সুচতুরা নূরজাহান কৌশলে আপনাকে এবং স্বামীকে মুক্ত করিতে সমর্থ হন। এই বিদ্রোহ দমন করিবার পূর্বেই জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়।

বিদ্রোহ

শাহজাহান: ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহজাহান মুঘল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালের প্রথম দিকে বুন্দেলখণ্ডের ঝুঝার সিংহের, দাক্ষিণাত্যের ভূতপূর্ব সুবাদার খাঁ জাহান লোদীর বিদ্রোহ এবং হুগলীর পর্তুগীজদের দমন করা হয়। বহু পর্তুগীজকে বন্দী করা হয়। তাঁহার রাজত্বকালে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কিয়দংশে মুঘল আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা হয়।

বিদ্রোহ দমন

শাহজাহান

দাক্ষিণাত্য নীতি: দাক্ষিণাত্যে রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টা শাহজাহানের আমলে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ঘটনা। মালিক অম্বরের প্রতিরোধের ফলে জাহাঙ্গীরের আমলে আহম্মদনগরকে

সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু মালিক অম্বরের মৃত্যুর পর অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে আহম্মদনগর দুর্বল হইয়া পড়ে। উৎকোচ দানের মাধ্যমে মুঘলগণ দৌলতাবাদ অধিকার করে এবং ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আহম্মদনগরের অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটে। আহম্মদনগরের সুলতানকে অবশিষ্ট জীবন গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী থাকিতে হয়।

আহম্মদনগরের স্বাধীনতার বিলুপ্তি

১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের আর দুইটি রাষ্ট্র বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার বিরুদ্ধে শাহজাহান স্বয়ং অগ্রসর হন। গোলকুণ্ডার সুলতান বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করেন। বিজাপুরের সুলতান যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হন। তিনি ক্ষতিপূরণ হিসাবে কুড়ি লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। গোলকুণ্ডার সুলতান বার্ষিক আট লক্ষ মুদ্রা কর দানে সম্মত হন। কিন্তু বিজাপুরের সুলতানকে বার্ষিক কর দান করিতে হইত না।

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা আক্রমণ

শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজেব (আওরঙ্গজেব) দাক্ষিণাত্যের মুঘল অধিকৃত ভূখণ্ডের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাগলানা অধিকার করেন। ঔরঙ্গজেব দ্বিতীয়বার দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তারূপে আগমন করিয়া বিভিন্ন অজুহাতে প্রথমে গোলকুণ্ডা ও পরে বিজাপুর আক্রমণ করেন। রাজ্য দুইটির পতন আসন্ন হইয়া পড়ে, কিন্তু শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারার প্রভাবে সম্রাট্ যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দান করেন, রাজ্য দুইটি রক্ষা পায়। কিন্তু উভয় রাজ্যের শাসককে এক কোটি মুদ্রা এবং রাজ্যাংশ মুঘলদিগকে প্রদান করিতে হয়।

ঔরঙ্গজেবের আগমন

মধ্য এশিয়া ঃ শাহজাহান আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়ায় রাজ্যবিস্তারের যে প্রচেষ্টা করেন তাহা ব্যর্থ হয়। ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগে শাহজাহানের চতুর্থ পুত্র মুরাদ বলখ ও বাদ্‌কশান অধিকার করেন। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে স্থান দুইটি মুঘলদের হস্তচ্যুত হইয়া পড়ে।

জাহাঙ্গীরের আমলে পারসিকগণ কান্দাহার অধিকার করে। ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এক পারসিক সেনাপতি বিশ্বাঘাতকতা করিলে মুঘলগণ পুনরায় কান্দাহার অধিকার করে। কিন্তু ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পারসিকগণ পুনরায় কান্দাহার অধিকার করে। প্রথম দুইবার ঔরঙ্গজেব এবং তৃতীয় বারে দারা কান্দাহার পুনরুদ্ধার করিতে ব্যর্থ হন। মুঘল সামরিক শক্তি হ্রাস পায়।

কান্দাহার

উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধঃ ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শাহজাহান কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন। শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারার সিংহাসনের দাবিকে অস্বীকার করিয়া শাহজাহানের পুত্রগণ উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়েন। শাহজাহানের চারিপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকো সুপণ্ডিত এবং উদার প্রকৃতির ছিলেন—ঐ কারণে ধর্মান্ধ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে পছন্দ করিতেন না। মধ্যম পুত্র সুজা ছিলেন বাংলার সুবাদার। তিনি ছিলেন সাহসী কিন্তু আরামপ্রিয়। তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজেব ছিলেন কর্মঠ, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, নির্ভীক যোদ্ধা ও ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান। তিনি ছিলেন দাক্ষিণাত্যের সুবাদার। কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ ছিলেন গুজরাটের সুবাদার। তিনি ছিলেন রণকুশল ও নির্ভীক কিন্তু মদ্যপায়ী ও উচ্ছৃঙ্খল। শাহজাহান রোগাক্রান্ত হইবার সময়ে দারা ছিলেন আগ্রায়। সুজা বাংলায় নিজেকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিয়া সসৈন্যে আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করেন। মুরাদ মালবে ঔরঙ্গজেবের সহিত মিলিত হইয়া দুজনে একযোগে আগ্রা যাত্রা করেন। এদিকে শাহজাহান সুস্থ হইয়া সেনাপতি যশোবন্ত সিংহ ও কাসিম খাঁকে ঔরঙ্গজেবকে দমন করিবার জন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু ধর্মাটের যুদ্ধে যশোবন্ত সিংহ পরাজিত হইলেন। ঔরঙ্গজেব দারাকে সামুগড়ের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া আগ্রা দখল করিয়া পিতাকে বন্দী করেন। অতঃপর মুরাদের প্রাণদণ্ডাদেশ হয়। দারা শিকো সীমান্তের নিকট ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। দারার

ঔরঙ্গজেবের জয়লাভ

পুত্র সুলেমান শিকো সুজাকে পরাজিত করেন। ঔরঙ্গজেব সুজাকে খাজুয়ার যুদ্ধে পরাজিত করিলে সুজা আরাকানে পলায়ন করেন। সুলেমান শিকো ধৃত ও নিহত হন। ঔরঙ্গজেব নিজেকে সম্রাট্ হিসাবে ঘোষণা করিয়া দেশ শাসন করিতে থাকেন।

শাহজাহান আট বৎসর বন্দীর জীবন যাপন করিয়া অশেষ দুঃখ-কষ্ট, লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান।

শাহজাহানের কৃতিত্বঃ কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে শাহজাহানের আমলে মুঘল সাম্রাজ্যের চরম উন্নতি হয়। শিল্পের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়। আগ্রা দুর্গে 'দেওয়ান-ই-আম', 'দেওয়ান-ই-খাস', 'শীস মহল', 'মোতি মসজিদ', দিল্লীর দেওয়ান-ই-আম,
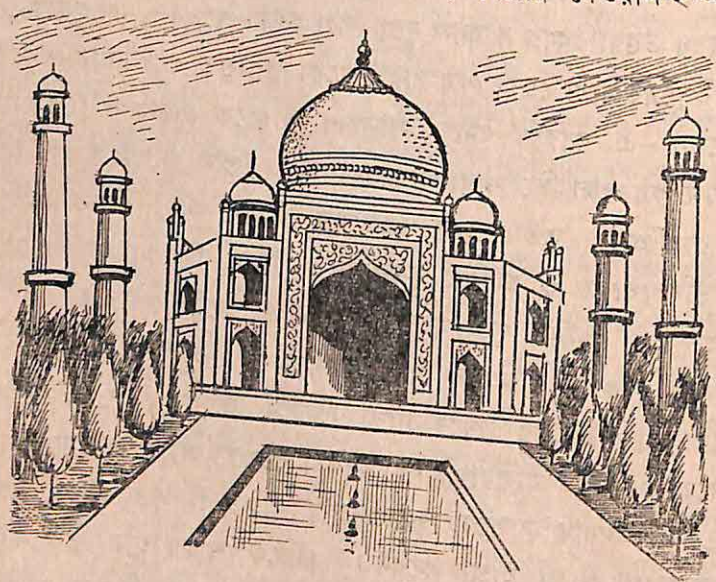
তাজমহল

দেওয়ান-ই-খাস, জাম-ই-মসজিদ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। দিল্লীতে 'শাহজাহানাবাদ' নামক নূতন শহর নির্মিত হয়। শাহজাহান পত্নী মমতাজমহলের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আগ্রায় 'তাজমহল' নির্মাণ করেন। 'তাজমহল' সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কীর্তি। একুশ বৎসর ধরিয়া পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে উহা নির্মিত হয়।

ঔরঙ্গজেব ঃ সম্রাট্ শাহজাহানের চারি পুত্রের মধ্যে যোগ্যতম ছিলেন ঔরঙ্গজেব বা আওরঙ্গজেব। তিনি অপর সকল ভ্রাতাদের নিধন করিয়া আগ্রা অধিকার করিয়া পিতাকে বন্দী করেন। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সময়ে তিনি 'আলমগীর' উপাধি গ্রহণ করেন।

ঔরঙ্গজেব

রাজ্য বিস্তার

সিংহাসনে আরোহণের কিছু-কাল পরে তিনি মীর জুমলাকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। সম্রাটের নির্দেশে মীর জুমলা ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে কোচবিহার এবং পর বৎসর আহোম রাজধানী গড়গাঁও অধিকার করেন। আহোমরাজ বার্ষিক কর দিতে সম্মত হন। কিন্তু কিছুকাল পরেই আহোমগণ মুঘলদিগকে বিতাড়িত করে।

মীর জুমলার পর বাংলার সুবাদার হন ঔরঙ্গজেবের মাতুল শায়েস্তা খাঁ। তিনি চট্টগ্রাম ও সন্দীপ অধিকার করেন।

১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসী আফ্রিদি এবং ইজসুফজাইগণ বিদ্রোহী হইলে ঔরঙ্গজেব স্বয়ং বিদ্রোহ দমন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ দুইটি উপজাতিদের নেতৃবর্গকে উৎকোচদানের মাধ্যমে বশীভূত করা হয়।

ঔরঙ্গজেব ছিলেন ধর্মান্ধ সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান। তিনি সমগ্র ভারতকে মুসলমানপ্রধান দেশে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন।

ধর্মনীতি

হিন্দুদের উপর অকারণ নির্যাতন চলিতে থাকে। জিজিয়া কর পুনরায় আরোপ করা হয়। কাশী, মথুরা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ হিন্দু তীর্থক্ষেত্রসমূহের বহু মন্দির ধ্বংস করা

হয়। হিন্দুদিগকে উচ্চপদে নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়। হিন্দু বণিকগণ অপেক্ষা মুসলমান বণিকদিগকে নানাপ্রকার সুযোগ দান করা হয়। রাজপুত ব্যতীত অপর কোন হিন্দুর পক্ষে পালকি, হস্তী, উত্তম অশ্বে আরোহণ এবং অস্ত্রবহন সম্ভবপর ছিল না। ঔরঙ্গজেবের আমলে শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানগণও নির্যাতিত হন।

ধর্মান্ধতা

ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতা এবং মারবারের পরলোকগত রানা যশোবন্ত সিংহের শিশুপুত্র অজিত সিংহের প্রতি কুব্যবহারের ফলে রাজপুতগণ অসন্তুষ্ট হন। মেবারের রানা রাজসিংহের সহিত ঔরঙ্গজেবের যুদ্ধের সূচনা হয়। রাজসিংহের মৃত্যুর পর জয়সিংহের সহিত ঔরঙ্গজেবের সন্ধি হয়। কিন্তু মারবারের সহিত যুদ্ধ চলিতে থাকে। ঔরঙ্গজেব শিশু অজিত সিংহকে মুঘল অন্তঃপুরে রাখিবার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু রাঠোর সর্দার দুর্গাদাস অজিত সিংহকে উদ্ধার করিয়া মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে থাকেন।

রাজপুতগণের অসন্তোষ

ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতার জন্য কেবল রাজপুতগণ নহে অন্যান্য বহু স্থানের হিন্দুগণও বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া মুঘলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। মথুরায় জাঠগণ বিদ্রোহ করে, তাহাদের নেতা ছিলেন গোকুল। সৎনামী সম্প্রদায়ও বিদ্রোহী হয়। বুন্দেলাগণ চম্পৎরাই এবং ছত্রশলের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। দারাকে সাহায্য করার অজুহাতে ঔরঙ্গজেব শিখদিগের নবম গুরু তেগবাহাদুরকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলে শিখগণ মুঘলদের প্রবল শত্রুতে পরিণত হয়। শিখগণ মুঘলদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রাম চালাইতে থাকে।

অন্যান্য বিদ্রোহ

দক্ষিণ ভারতের মারাঠাগণও শিবাজীর নেতৃত্বে মুঘলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে থাকে। মারাঠাদিগকে দমন করিতে ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে আগমন করেন এবং ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়; কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল মারাঠাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াও তাহাদের দমন করিতে ব্যর্থ হন।

মারাঠা জাতির উত্থানঃ ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতির অভ্যুত্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মহারাষ্ট্রে মুসলমান শাসনকালে বহু মারাঠা উচ্চ সরকারী পদ লাভ করিয়া সামরিক ও বেসামরিক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। মহারাষ্ট্রের পর্বতসংকুল ভূ-প্রকৃতি মারাঠাদের সংগ্রামী হইয়া উঠিতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

অভ্যুথানের কারণ-সমূহ

একনাথ, তুকারাম, রামদাস প্রভৃতি ধর্মপ্রচারকগণের প্রচেষ্টায় মারাঠাদিগের মধ্যে একাত্মবোধ জাগরিত হয়।

মারাঠা-অভ্যুত্থানের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কারণ শিবাজীর মহান্ নেতৃত্ব।

শিবাজীঃ ১৬২৭ (মতান্তরে ১৬৩০) খ্রীষ্টাব্দে পুণা জেলার অন্তর্গত শিবনের দুর্গে শিবাজীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম শাহজী এবং মাতার নাম জীজাবাঈ।

শাহজী বিজাপুরের সুলতানের অধীনে কর্মগ্রহণ করিয়া সুলতান কর্তৃক প্রদত্ত জায়গীরে অবস্থান করিতেন। শিবাজী মাতা জীজাবাই-এর সহিত দাদাজী কোণ্ডদেব নামক জনৈক ব্রাহ্মণের তত্ত্বাবধানে পুণায় বাল্যজীবন অতিবাহিত করেন। শিবাজীর চরিত্রে তাঁহার মাতা, দাদাজী কোণ্ডদেব এবং রামায়ণ ও মহাভারতের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। দাদাজী কোণ্ডদেবের নিকট হইতে তিনি সামরিক শিক্ষা এবং শাসন সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন।

প্রথম জীবন

শিবাজী অতি অল্প বয়সে মাওয়ালী নামক পার্বত্য জাতির ব্যক্তিদের লইয়া একটি শক্তিশালী সৈন্যদল গঠন করেন। বিজাপুর রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে প্রথমে তোরনা এবং পরে কোণ্ডনা দুর্গ অধিকার করেন। অল্পকালের মধ্যে তিনি বিশাল ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করেন। শিবাজীকে সংযত করিবার উদ্দেশ্যে বিজাপুরের সুলতান শাহজীকে কারারুদ্ধ করেন, ফলে পিতাকে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে শিবাজী কিছুকালের জন্য শান্ত থাকেন। কিন্তু ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দের পর তিনি পুনরায় ভূখণ্ড

ভূখণ্ড অধিকার

আধিকারের প্রচেষ্টা করেন এবং পুরন্দর দুর্গ, জাওলী রাজ্য, উত্তর কোঙ্কন প্রভৃতি অধিকার করেন।

বিজাপুরের সহিত সংঘর্ষ: শিবাজীকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে বিজাপুরের সুলতান ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সেনাপতি আফজল খাঁকে প্রেরণ করেন। আফজল খাঁ শিবাজীকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে শিবাজীর সহিত সন্ধির শর্ত আলোচনার জন্য মিলিত হন। শিবাজী আফজল খাঁর দুরভিসন্ধির বিষয় পূর্বেই অবগত হন। তিনি এক সাক্ষাৎ-কারের সময়ে আফজল খাঁকে হত্যা করেন। সেনাপতির আকস্মিক মৃত্যুতে বিজাপুরের সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। শিবাজী কোহ্লাপুর এবং দক্ষিণ কোঙ্কন অধিকার করেন। শিবাজীর বিরুদ্ধে অভিযানসমূহ ব্যর্থ হওয়ায় বিজাপুরের সুলতান শিবাজীর সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন।

শিবাজী

আফজল খাঁর হত্যা

মুঘল শক্তির সহিত সংঘর্ষ: শিবাজীকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁহার মাতুল শায়েস্তা খাঁকে প্রেরণ করেন। শায়েস্তা খাঁ শিবাজীর কয়েকটি দুর্গ অধিকার করেন। কিন্তু ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে শায়েস্তা খাঁ যখন পুণায় অবস্থান করিতে-ছিলেন সেই সময়ে এক নৈশ আক্রমণে শিবাজী শায়েস্তা খাঁকে বিপর্যস্ত করেন। শায়েস্তা খাঁকে একটি অঙ্গুলি হারাইতে হয়, তাঁহার পুত্রও নিহত হন। পর বৎসর শিবাজী সুরাট লুণ্ঠন করিয়া প্রভূত ধনরত্ন লাভ করেন।

শায়েস্তা খাঁর বিপর্যয়

শায়েস্তা খাঁর পর সেনাপতি জয়সিংহ এবং দিলীর খাঁ শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। জয়সিংহের কূটনীতির নিকট শিবাজী পরাস্ত হন। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজী মুঘলদের সহিত পুরন্দরের সন্ধি স্বাক্ষর করেন। তিনি মুঘল সম্রাট্‌কে ১৬ লক্ষ মুদ্রা আয়ের কয়েকটি জেলা এবং ২৩টি দুর্গ সমর্পণ করেন। শিবাজী জায়গীর লাভ করেন। তাঁহার পুত্র শম্ভূজী পাঁচ হাজার সৈন্যের মনসবদার নিযুক্ত হন।

পুরন্দরের সন্ধি

জয়সিংহের পরামর্শে শিবাজী আগ্রা গমন করেন। ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন না করায় শিবাজী প্রতিবাদ জানাইলে ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখেন। শিবাজী কৌশলে প্রহরীদিগকে প্রতারণা করিয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হন।

আগ্রায় শিবাজী

১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রায়গড়ে শিবাজীর রাজ্যাভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ঐ অনুষ্ঠানে তিনি 'ছত্রপতি' এবং 'গো-ব্রাহ্মণ-প্রতিপালক' উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি মুঘলদের নিকট যে সকল দুর্গ সমর্পণ করিয়াছিলেন সেগুলির পুনরুদ্ধার করেন। বেরার, বাগলানা এবং সুরাট লুণ্ঠন করেন। মুঘলদিগের পক্ষে নানা কারণে ঐ সময়ে শিবাজীকে দমন করা সম্ভব হয় নাই।

রাজ্যাভিষেক

শিবাজী গোলকুণ্ডার সুলতানের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়া কর্ণাটক আক্রমণ করেন। তিনি জিঞ্জি, ভেলোর এবং মহীশূরের একাংশ অধিকার করেন। কিন্তু ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজীর আকস্মিক মৃত্যুর ফলে শিবাজীর স্বপ্ন অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়।

মৃত্যু

শাসন-ব্যবস্থা ঃ শিবাজীর শাসন-ব্যবস্থায় রাজার স্থান ছিল শীর্ষে। শাসনকার্যে রাজাকে সাহায্যদানের জন্য আটজন মন্ত্রী লইয়া 'অষ্টপ্রধান' নামে একটি মন্ত্রিপরিষদ ছিল। মন্ত্রীদের মধ্যে যিনি প্রধান তাঁহাকে পেশোয়া বলা হইত। অমাত্য, মন্ত্রী, সামন্ত, সচিব, পণ্ডিতরাও, ন্যায়াধীশ প্রভৃতি মন্ত্রীর অস্তিত্ব ছিল।

শিবাজীর রাজ্য কয়েকটি প্রদেশ বা প্রান্তে বিভক্ত ছিল। প্রান্তগুলি আবার তরফে (গ্রামের সমষ্টি) বিভক্ত ছিল। প্রদেশগুলিতেও কেন্দ্রের ন্যায় আট জন সদস্যের একটি মন্ত্রিপরিষদ ছিল। উৎপন্ন
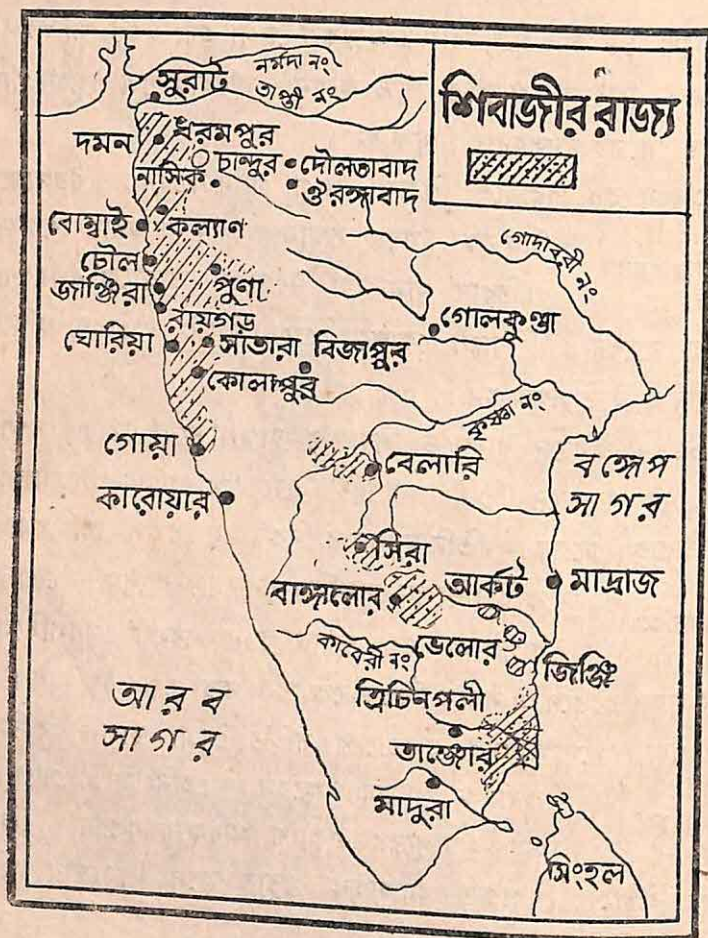
শস্যের $\frac{১}{৩}$ অংশ কর দিতে হইত। ইহা ব্যতীত শিবাজী প্রতিবেশী রাজ্যগুলি হইতে 'চৌথ' (রাজস্বের $\frac{১}{৪}$ অংশ) এবং 'সরদেশমুখী' (রাজস্বের $\frac{১}{১০}$ অংশ) আদায় করিতে থাকেন। পরবর্তী কালে ঐ কর দুইটি মারাঠা সাম্রাজ্য বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

রাজস্ব

সামরিক সংগঠন : শিবাজী স্থায়ী সৈন্যদল গঠন করিয়া সৈন্যদিগকে বেতন দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সেনাবাহিনীতে কঠোর শৃঙ্খলার অস্তিত্ব ছিল। সৈন্যগণ 'বারগীর' এবং 'শিলাদার' এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল।

শিবাজীর একটি নৌ-বাহিনীও ছিল। নৌ-বাহিনী প্রায় চারিশত বিভিন্ন প্রকার পোতের সমন্বয়ে গঠিত ছিল।

শিবাজীর পর মুঘল-মারাঠা বিরোধ : শিবাজীর মৃত্যুর পরও মারাঠাগণ অমিত বিক্রমে মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতে থাকে। ঔরঙ্গজেব স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করিয়াও মারাঠাদিগকে দমন করিতে ব্যর্থ হন।

শিবাজীর মৃত্যুর পর শম্ভুজী রাজা হন। কিন্তু তিনি মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার জন্য শক্তি সঞ্চয় না করিয়া অযথা শক্তির অপচয় করিতে থাকেন। ঔরঙ্গজেব যখন বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন, তিনি সেই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ঔরঙ্গজেব বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা অধিকার করিবার পর শম্ভুজীর রাজ্য আক্রমণ করিলে শম্ভুজী পরাজিত ও বন্দী হন। অবর্ণনীয় শারীরিক কষ্ট দান করিয়া তাঁহাকে হত্যা করা হয়। শম্ভুজীর শিশুপুত্র শাহু বন্দী হন।

শম্ভুজী ও মুঘল সংঘর্ষ

শম্ভুজীর পতনের পর মারাঠাগণ শিবাজীর অপর পুত্র রাজারামকে মারাঠা রাজ্যের রাজা হিসাবে স্বীকৃতি দান করে। রাজারাম কর্ণাটকের দুর্ভেদ্য জিঞ্জি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজারামের নেতৃত্বে মারাঠাগণ মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখিতে সক্ষম হয়। মারাঠাগণ খান্দেশ এবং বেরার হইতে 'চৌথ' ও 'সরদেশমুখী' আদায় করিতে থাকে। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাগণ মুঘলবাহিনীকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়। মুঘলবাহিনী পানহালা দুর্গ অধিকার করিতে ব্যর্থ হয়। মুঘলবাহিনীর ব্যর্থতার ফলে ঔরঙ্গজেব স্বয়ং মারাঠাদিগের

রাজারাম ও ঔরঙ্গজেব

বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি সাতারা এবং অপর কয়েকটি দুর্গও অধিকার করেন।

১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে রাজারামের মৃত্যুর পর তাঁহার নাবালক পুত্র তৃতীয় শিবাজী রাজা হন। রাজারামের পত্নী তারাবাঈ মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। মারাঠাগণ মুঘল-অধিকৃত বেরার, গুজরাট, মালব প্রভৃতি লুণ্ঠন করিতে থাকে। ঔরঙ্গজেব মারাঠা-দিগকে দমন করিবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াও ব্যর্থ হন। দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদিগের বিরুদ্ধে সংগ্রামকালে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়।

ঔরঙ্গজেবের ব্যর্থতা

অনুশীলনা

১। মুঘল কাহারা? মুঘল বাবর সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
২। শেরশাহের শাসন-ব্যবস্থা আলোচনা কর।
৩। আকবরের রাজ্যজয় কাহিনী বর্ণনা কর।
৪। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল এবং নূরজাহানের সম্বন্ধে আলোচনা কর।
৫। শাহজাহানের রাজত্বকালে মুঘল শক্তির প্রসার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
৬। ঔরঙ্গজেবের সহিত মারাঠাগণের সংঘর্ষের ইতিহাস লিখ।
৭। ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতি সম্বন্ধে আলোচনা কর।
৮। শিবাজী সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
৯। টীকা লিখঃ (ক) সংগ্রামসিংহ, (খ) পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ, (গ) রানা প্রতাপের মুঘলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, (ঘ) রানী দুর্গাবতী ও চাঁদ বিবি, (ঙ) শাহজাহানের শেষ জীবনে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ।

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

(ক) মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?
(খ) খানুয়ার যুদ্ধে বাবর কাহাকে পরাজিত করেন?
(গ) হিমুর সহিত বৈরাম খাঁর কোথায় যুদ্ধ হয়?
(ঘ) মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?
(ঙ) খুররম্ কোন ঘটনার পর 'শাহজাহান' উপাধি লাভ করেন?
(চ) মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

———

পরিশিষ্ট (ক)

ঘটনাপঞ্জী

আঃ খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ (আঃ খ্রীঃ পূঃ) ৫০০		বৈদিক যুগ
আঃ খ্রীঃ পূঃ ৫০০	...	মহাবীর ও বুদ্ধের আমল
খ্রীঃ পূঃ ৩২৭	...	আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ
আঃ খ্রীঃ পূঃ ৩২৪	...	মৌর্য শাসনের প্রতিষ্ঠা
আঃ খ্রীঃ পূঃ ৭৮	..	কণিষ্কের সিংহাসনে আরোহণ
খ্রীঃ ৩২০	...	গুপ্তবংশীয় শাসনের সূচনা
খ্রীঃ ৬০৬	...	হর্ষের সিংহাসন লাভ
আঃ খ্রীঃ ৬৩৭	..	শশাঙ্কের মৃত্যু
আঃ খ্রীঃ ৭৫০	..	গোপালের রাজপদে নির্বাচন
খ্রীঃ ৭৭০-৮১০	...	ধর্মপালের রাজত্বকাল
খ্রীঃ ৮১০-৮৫০	...	দেবপালের রাজত্বকাল
আঃ খ্রীঃ ১১৫৮	...	বল্লালসেনের সিংহাসন লাভ
আঃ খ্রীঃ ১১৭৯	...	লক্ষ্মণসেনের সিংহাসন লাভ
খ্রীঃ ৬৪২	...	চালুক্য দ্বিতীয় পুলকেশীর মৃত্যু
খ্রীঃ ৯১৭	...	রাষ্ট্রকূট তৃতীয় ইন্দ্রের কনৌজ লুণ্ঠন
খ্রীঃ ৫৭০	...	হজরত মহম্মদের জন্ম
খ্রীঃ ১০০০-১০২৬	...	সুলতান মামুদের ভারত অভিযানসমূহ
খ্রীঃ ১১৯২	...	পৃথ্বীরাজ চৌহানের পরাজয়
	...	'দিল্লীর দাসবংশের' শাসনের সূচনা
খ্রীঃ ১২২১	...	চেঙ্গিজ খাঁর আগমন
খ্রীঃ ১২৯০	...	খিলজী বংশীয় শাসনের সূচনা
খ্রীঃ ১৩০৩	...	আলাউদ্দীন কর্তৃক চিতোর জয়
খ্রীঃ ১৩২০	...	তুঘলক বংশের শাসনের সূচনা
খ্রীঃ ১৩২৬-২৭	...	দৌলতাবাদে মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তরিত
খ্রীঃ ১৩৩০	...	তামার নোটের প্রচলন
খ্রীঃ ১৩৩৬	...	বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা
খ্রীঃ ১৩৪৭	...	বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা
খ্রীঃ ১৫২৬	...	পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ও বাবর কর্তৃক মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠা
খ্রীঃ ১৫৪০	...	শেরশাহ কর্তৃক হুমায়ুন বিতাড়িত
খ্রীঃ ১৫৫৬	...	পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ
খ্রীঃ ১৫৫৬-১৬০৫	...	আকবরের রাজত্বকাল
খ্রীঃ ১৬০৫-১৬২৭	...	জাহাঙ্গীরের আমল

খ্রীঃ ১৬২৭-১৬৫৮	...	শাহজাহানের আমল
খ্রীঃ ১৬৫৭-১৬৫৮	...	শাহজাহানের পুত্রগণের মধ্যে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ
খ্রীঃ ১৬৭৪	...	শিবাজীর রাজ্যাভিষেক
খ্রীঃ ১৭০৭	...	ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু।

পরিশিষ্ট (খ)

[পর্ষদ বার্তার অনুসরণে]

(ক) সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন :—

১। পুরাতন প্রস্তরযুগের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

২। নব্য প্রস্তরযুগের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৩। তাম্রযুগের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৪। পুরাতন প্রস্তরযুগে অগ্নির ব্যবহার ছিল কি? কোন যুগে মানবজাতি অগ্নির ব্যবহার করিতে শুরু করে?

৫। সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা কোন যুগের? ঐ সভ্যতার স্রষ্টা কাহারা? কোন দুইটি স্থানে ঐ সভ্যতার নির্দশন পাওয়া গিয়াছে? ঐ সভ্যতার নির্দশনের আবিষ্কারের সূচনা কে করেন?

৬। এদেশে আর্যগণের আগমনের কারণ কি ছিল? আর্যদের বসতি বিস্তার সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৭। পরবর্তীকালের বৈদিক সাহিত্যের অংশ রূপে মহাকাব্য দুইটির নাম বল। মহাকাব্য দুইটিতে জাতিভেদের উল্লেখ আছে কি? মহাকাব্য দুইটির এদেশের জনগণের উপর প্রভাব আছে কি?

৮। জৈনধর্মের প্রথম এবং শেষ তীর্থংকর কে ছিলেন? ত্রয়োবিংশ তীর্থংকরের নাম বল।

৯। 'পূর্ব', 'দ্বাদশ অংগ', 'শেতাম্বর' ও 'পীতাম্বর' প্রভৃতি কোন ধর্মের সঙ্গে যুক্ত?

১০। 'ত্রিপিটক' 'হীনযান' 'মহাযান' প্রভৃতি কোন ধর্মের সহিত যুক্ত?

১১। বিম্বিসার কে ছিলেন? আধিপত্য বিস্তারের জন্য তিনি কয়টি নীতির অনুসরণ করেন? তিনি কি ভাবে সিংহাসনচ্যুত হন?

১২। নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? কি কারণে তাঁহাকে ভারতের প্রথম সার্বভৌম সম্রাট বলা যাইতে পারে।

১৩। মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? তাঁহার সমসাময়িক গ্রীক শাসক কে ছিলেন? গ্রীক বীরের সহিত প্রথম মৌর্যরাজের সম্পর্কের উল্লেখ কর।

১৪। মেগাস্থিনিস কে ছিলেন? কি কারণে তিনি এদেশে আগমন করেন?

১৫। কোন ঘটনার পর মৌর্য সম্রাট অশোকের নীতিতে পরিবর্তন ঘটে ?

১৬। সর্বশ্রেষ্ঠ কুষাণ শাসক কে ছিলেন ? তিনি কোন ধর্মের অনুরক্ত ছিলেন ? তাঁহার আমলের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা কি ছিল ?

১৭। সমুদ্রগুপ্তের নিকট পরাজিত কয়েক জন শাসকের নাম বল। দক্ষিণ ভারতে তিনি কি নীতি গ্রহণ করেন ? তিনি কোন ধর্মে অনুরক্ত ছিলেন ? তাঁহার সমসাময়িক স্বর্ণভূমির শাসক কে ছিলেন ?

১৮। গুপ্তসম্রাটগণের মধ্যে কাহাকে কিম্বদন্তীর 'বিক্রমাদিত্য' বলিয়া অনুমান করা হয় ? তিনি কাহাদিগকে পরাজিত করিয়া খ্যাতিলাভ করেন ?

১৯। হর্ষবর্ধনের রাজধানী কোথায় অবস্থিত ছিল ? তাঁহার সমসাময়িক তিনজন উল্লেখযোগ্য শাসকের নাম বল। দক্ষিণ ভারতে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কে ছিলেন ?

২০। শশাঙ্ক কে ছিলেন ? তাঁহার সমসাময়িক উত্তর ভারতের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ শাসক কে ছিলেন ? শশাঙ্কের রাজধানীর নাম কি ?

২১। বাংলাদেশে কোন সময়ে 'মাৎস্যন্যায়ের' অবস্থা দেখা দেয় ? কে ঐ অবস্থা দূর করেন ?

২২। পালবংশের কোন শাসকের সহিত স্বর্ণভূমির শাসকের যোগাযোগ ঘটে ? ঐ যোগাযোগের কারণ কি ছিল ?

২৩। অর্থশাস্ত্রের রচয়িতা কে ? উহা কি মৌর্যযুগে রচিত ?

২৪। 'ইণ্ডিকার' রচয়িতা কে ? মূল গ্রন্থটির সন্ধান কি পাওয়া গিয়াছে ?

২৫। ফা-হিয়েন কেন এদেশে আগমন করেন ? কোন শাসকের রাজত্ব-কালে তিনি আগমন করেন ? ঐ সময়ে অস্পৃশ্যতার অস্তিত্ব ছিল কি ?

২৬। হিউয়েন সাঙ্ কে ? তিনি এদেশে কাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ?

২৭। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে কোন যুগকে স্বর্ণময় যুগ বলা হয় ? ঐ যুগের সর্বক্ষেত্রে উন্নতির কারণ কি ছিল ?

২৮। কি কারণে সপ্তম শতকে তিব্বতের সহিত ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হয় ? যে সকল ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতে গমন করেন তাঁহাদের কয়েকজনের নাম বল।

২৯। স্কন্দগুপ্তের পর হূনদের কে শক্তিবৃদ্ধি করেন ? কাহার প্রচেষ্টায় হূনগণ পরাজিত হয় ?

৩০। অষ্টম শতকে কাহারা এদেশের কোন স্থান আক্রমণ করে? ঐ আক্রমণ কে প্রতিহত করার চেষ্টা করেন ? ঐ আক্রমণের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ফল কি ?

৩১। একাদশ শতকে তুর্কী আক্রমণের নায়ক কে ছিলেন ? তিনি কোন রাজ্যের অধিপতি ছিলেন ? তাঁহার বিরুদ্ধে কোন রাজ্যের হিন্দু শাসকগণ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন ?

৩২। এদেশে দ্বাদশ শতকে মুসলমান আক্রমণের নেতা কে ছিলেন ? তাঁহার সহিত কোন্ উল্লেখযোগ্য শাসকের সংঘর্ষ বাধে ? তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে কে জয়লাভ করেন ?

৩৩। চর্যাপদ কি? কে কোথায় চর্যাপদ আবিষ্কার করেন? চর্যাপদগুলির গুরুত্ব কি?

৩৪। বাংলায় কে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করেন? কি কারণে ঐ প্রথার প্রবর্তন করা হয়?

৩৫। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' কি? কে সংকলন করেন? ঐ গ্রন্থের কবিতা এবং কবির সংখ্যা কত? ঐ গ্রন্থে কোন্ কোন্ সেন বংশীয় শাসকের রচনা স্থান পায়?

৩৬। চালুক্য বংশের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শাসক কে ছিলেন? তাঁহার সমসাময়িক উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ শাসক কে ছিলেন?

৩৭। কৈলাসনাথের মন্দির কাহার আমলে নির্মিত হয়? 'রত্নমালিকা' কে রচনা করেন?

৩৮। পল্লব রাজ্যের রাজধানী কোথায় ছিল? ঐ রাজ্যের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শাসক কে ছিলেন? তাঁহার আমলের উল্লেখযোগ্য শিল্প কীর্তির উল্লেখ কর।

৩৯। রাজরাজেশ্বরের মন্দির কাহার আমলে নির্মিত হয়? তিনি কি পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন?

৪০। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক কে? তাঁহার ধর্মবিষয়ক নির্দেশনামার উল্লেখ কর।

৪১। দিল্লীর সুলতানীর কে সূচনা করেন? তিনি কি নামে পরিচিত ছিলেন? কিভাবে তাঁহার মৃত্যু হয়?

৪২। ইলতুৎমিস কে ছিলেন? তাঁহার রাজত্বকালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা কি?

৪৩। কাহার আমলে দক্ষিণ ভারতে সর্বপ্রথম মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়? ঐ আক্রমণের নায়ক কে ছিলেন?

৪৪। দিল্লীর সুলতানীর সর্বশেষ শাসক কে ছিলেন? কোন যুদ্ধের ফলে সুলতানী শাসনের অবসান ঘটে?

৪৫। বিজয়নগর রাজ্যের প্রথম রাজবংশের নাম বল। ঐ রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক কে? কোন যুদ্ধের পর বিজয়নগরের পতন ঘটে?

৪৬। ভক্তিবাদ কাহাকে বলে? সুফীবাদ কি? উভয় মতবাদে বিশ্বাসীগণ হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করিতেন কি?

৪৭। 'শিখ' শব্দের অর্থ কি? শিখ ধর্মের প্রবর্তক কে ছিলেন?

৪৮। এদেশে মুঘল শাসনের কে সূচনা করেন? কোন যুদ্ধের ফলে মুঘল শাসন নিষ্কণ্টক হয়? মুঘল শাসনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

৪৯। সর্বশেষ শক্তিশালী মুঘল সম্রাট কে? তাঁহার ধর্মান্ধতার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ফল কি?

৫০। মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজাপুরের সেনাপতি কে ছিলেন? কিভাবে যুদ্ধের মীমাংসা হয়?

Objective test

(খ) শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ—

১। পুরাতন প্রস্তর যুগের পরবর্তী যুগকে — বলা হয়।
২। সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা ছিল প্রধানত —।
৩। বৈদিক যুগের প্রথম ভাগের সভ্যতা ছিল —।
৪। মহাবীরের শিষ্যগণ — নামে পরিচিত ছিলেন।
৫। সিদ্ধার্থ মাত্র — বৎসর বয়সে সিদ্ধিলাভ করেন।
৬। নন্দ বংশের শাসনের সূচনা করেন —।
৭। কলিঙ্গ বিজয়ের ফলে — মৌর্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।
৮। কনিষ্কের রাজধানী ছিল —।
৯। পাল বংশের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শাসক ছিলেন —।
১০। গুপ্ত যুগে শিল্পকেন্দ্র রূপে — ও — প্রসিদ্ধ ছিল।
১১। শৈলেন্দ্র রাজগণের মূল রাজ্য ছিল —।
১২। গজনীর সুলতান মামুদ — বার ভারতের বিভিন্ন রাজ্য আক্রমণ করেন।
১৩। রাজরাজ চোল — এ বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণের অনুমতি দান করেন।
১৪। দিল্লীর সুলতানীর প্রথম বংশকে — বলা হয়।
১৫। — খ্রীষ্টাব্দের — এপ্রিল পানিপথের প্রথম যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়।
১৬। কবীরের অনুসরণে উত্তর ভারতে — নামক এক বিশেষ শ্রেণীর কাব্য গড়িয়া উঠে।
১৭। বাবর মাতৃসূত্রে ছিলেন — বংশধর।
১৮। রাণা প্রতাপ ও মুঘল শক্তির মধ্যে ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে — এর যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়।
১৯। আহম্মদনগর জয়ের পর খুররম — উপাধি লাভ করেন।
২০। রাজ্যাভিষেক কালে শিবাজী — এবং — উপাধি গ্রহণ করেন।

(গ) সঠিক উত্তরগুলির পাশে (✓) চিহ্ন বসাও ঃ—

১। সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা — তাম্র যুগের, তাম্রপ্রস্তর যুগের, নব্য প্রস্তর যুগের।
২। প্রাচীনতম বৈদিক সাহিত্য — ঐতরেয় আরণ্যক, ঋগ্বেদ, মনুসংহিতা।
৩। সর্বশ্রেষ্ঠ কুষাণ শাসক ছিলেন — হুবিষ্ক, বাসুদেব, কনিষ্ক, বসিষ্ক।
৪। মগধের নেতৃত্বে রাজনৈতিক ঐক্যের সূচনা করেন — বিম্বিসার, অশোক, চন্দ্রগুপ্ত।
৫। মৌর্য যুগে আগমন করেন — ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ্, মেগাস্থিনিস।
৬। কনিষ্কের রাজধানী ছিল — পাটলিপুত্র, পুরুষপুর, তাম্রলিপ্ত।

৭। সর্বপ্রথম সার্বভৌম বাঙালী শাসক ছিলেন — ধর্মপাল, শশাঙ্ক, লক্ষ্মণসেন।

৮। দিল্লীর প্রথম সুলতান ছিলেন—ইব্রাহিম লোদী, বলবন, কুতব-উদ্দীন।

৯। বিজয়নগরে সর্বপ্রথম—শালুভ, সঙ্গম, তুলুব বংশের শাসনের অস্তিত্ব ছিল।

১০। মুঘল শাসনের সূত্রপাত ঘটে—১২০৬, ১৫২৬, ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে।

১১। মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বশেষ শক্তিশালী শাসক ছিলেন—আকবর, শাহজাহান, ঔরঙ্গজেব।

১২। শিখধর্মের প্রবর্তক ছিলেন—গুরু অর্জুন, গুরু নানক, গুরু গোবিন্দ সিংহ।

(ঘ) নিম্নের শব্দগুলি সময় অনুসারে বসাও :—

১। নব্যপ্রস্তর যুগ, তাম্র যুগ, পুরাতন প্রস্তর যুগ।

২। অশোক, বিম্বিসার, দেবপাল, অজাতশত্রু, মহাপদ্মনন্দ।

৩। রামায়ণ, কাদম্বরী, ঋগ্বেদ।

৪। বলবন, কুতবউদ্দীন আইবক, বাবর, মহম্মদ বিন তুঘলক, ঔরঙ্গজেব, আকবর।

৫। খানুয়ার যুদ্ধ, গোগ্রার যুদ্ধ, হলদিঘাটের পানিপথের প্রথম যুদ্ধ।

৬। নূরজাহান, রজিয়া, চাঁদবিবি, মমতাজমহল।

সমাপ্ত